

আল্লামা ইকবাল

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী



আল্লামা ইকবাল

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল্লামা ইকবাল

জীবনী চরিত্র চিন্তা

আল্লামা ইকবাল : মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী ॥ ই.ফা.বা. প্রকাশনা :
১৩৬০ ॥ ই. ফা. বা. প্রস্তুতকার : ৯২৮, ৯১৪৩ ॥ প্রথম প্রকাশ :
রবিউল সানী ১৪০৭, পৌষ ১৩৯৩, ডিসেম্বর ১৯৮৬ ॥ প্রকাশনায় :
অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ, বাগতুল মুকাররম, ঢাকা-২, বাংলাদেশ ॥ প্রচ্ছদ অংকনে :
রফিকুল ইসলাম ॥ মুদ্রণ : সুয়েরা বেগম চৌধুরী, রাহীশান প্রেস,
২২৩, মালিবাগ, ঢাকা-১৭ ॥ বাঁধাইয়ে : জাকির এও স্পস ॥ চ,
বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা-১ ॥

মূল্য : বাইশ টাকা

Allama Iqbal : (Life and Thoughts of Dr. Muhammad Iqbal)
written in Bengali by Muhammad Abu Taher Siddique,
Published by the Islamic Foundation Bangladesh.

December 1986,

Price : Taka. 22.00 ; U. S. Dollar : 2.00

মরহুম দাদাজান
জনাব আফজল আলীর
রুহের মাগফিরাত
কামনায়

আল্লামা ইকবাল

সবক পড় ফের সদাকত কা শুজা'আত কা আদালত কা
লিয়ে জায়েগা তুজ সে কাম দুনিয়া কি ইমামত কা

প্রকাশকের কথা

জাতীয় উত্তরণে শতাব্দীর চিন্তাভ্রমতে আলোড়ন সৃষ্টি-কারী যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের মহান অবদানের ব্যাপারে কোনে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের অবশ্যই এটি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এই মহান কবি-দার্শনিকের জীবন ও পয়গামের যথাযথ মূল্যায়ন সম্বলিত পুস্তকের সংখ্যা বাংলা ভাষায় কম। অথচ এই কবি ও মহান সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় আমাদের জাতীয় উত্থানের স্বার্থেই প্রয়োজন।

এ দুটিকোনকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আল্লামা ইকবালের জীবন ও দর্শনকে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে। জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকীর ‘আল্লামা ইকবাল’ গ্রন্থে ইকবাল-উপস্থাপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এ থেকে কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকা ইকবাল সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন আশা করা যায়।

এদেশে ইকবাল-চর্চার ক্ষীণ ধারার সাথে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একটি বেগবান ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহু সংযোজন হিসেবে আমরা পেশ করছি।

ভূমিকা

মহাকবি ইকবাল এ উপমহাদেশে এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবি, দার্শনিক, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর অবদান চিরকালই অবিষ্মরণীয়। এ অঞ্চলে তিনি প্রধানত পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা হিসাবে পরিচিত হলেও—আজ বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রতিভার ও অবদানের স্বীকৃতি মুখরিত হচ্ছে। ইসলামী প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন কালে যে সব মতবাদ প্রবেশ করে তাতে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল—তিনি সেগুলোর যথাযথ বিচার করে তাদের যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইমাম গাজ্বালীর অনুরূপ। তবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন—তাঁও অভিনব দার্শনিক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্ব জগতে তাঁকে একটা শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। এ বিশ্বচরাচরের সর্বত্র তিনি গতিশীল জীবনের সজ্জান পেয়েছেন এবং আল্লাহ্কেও তিনি চরম এক সৃষ্টিশীল সত্তা বলে লাভ করেছেন। তাঁর অবদানের অপর শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে খুদী—যা’ মানব সাধারণকে তার বিকাশের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

তাঁর এবংবিধ মতবাদই তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব ধারণা এ বিশ্বের ইতিহাসে সম্পূর্ণই অভিনব এবং এ দুনিয়া তাঁর এ সকল অবদানের জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য সর্বসাধারণ পাঠকের বিশেষত কোমলমতি বাচ্চক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর আগ্রহ সকল দেশেই রয়েছে। মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী বাংলা ভাষাতাষী পাঠক-পাঠিকা বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে তাঁর জীবনী রচনা করে দেশবাসীর প্রতি তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করে এ পুস্তক রচনা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এবং তা দেশের সর্বত্রই যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করবে।

লেখকের কথা

বিশ্ববিশ্রুত কালজয়ী ব্যক্তিত্ব আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। তাঁর অমর কাব্য তাঁকে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও দূর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছে। জানী-গুণী ও সুধীমহলে তিনি সার্বজনীনভাবে সমাদৃত। জ্ঞান সাধনার তিনি যেমন ছিলেন অতল ডুবুরী, তাঁর কলমও ছিল তেমনি ক্ষুরধার। পাণ্ডিত্য যেমন তাঁর শীর্ষস্থানীয়, বাণীও তেমনি মহামূল্যবান—সার্বজনীন মূলবোধের নীতি নির্ধারক।

নিছক একজন মহৎ কবি নন তিনি, বরং একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, প্রতিশ্রুতি চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ অবদান চির শ্রদ্ধেয়। বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর বাণী ও কাব্য চিরদিন আলোক-বতিকা হয়ে থাকবে।

ছাত্র জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কবির ‘তারানা-ই-মিল্লা’ আবৃত্তি শুনে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগে। সঙ্গীতের মর্মার্থ না বুঝলেও সুরের মুচ্ছনায় বিমোহিত হয়ে পড়তাম। মুহুর্তম শিক্ষকদের কাছে ইকবাল সম্পর্কিত অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনে আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম। তাঁর অবিঃসরণীয় কাব্য-শক্তি ও যোগ্যতা আমাকে নতুন চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত করতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনার সুযোগ হয়নি।

১৯৮৩ সালে ইকবালের ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত স্মরণিকা ও আয়োজিত সভা থেকে আমি কবি সম্পর্কে নতুন ধারণা পাই। উক্ত স্মরণিকায় ‘আল্লামা ইকবাল : জীবনধর্মী ও গ্রন্থাবলী’ শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। আয়োজিত সভার বক্তাদের সারগর্ভ আলোচনায় আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও আমাদের দেশে ইকবাল চর্চার দৈন্যের জন্য মর্মান্বিত হই। বলতে গেলে তখন থেকেই আমি কবি সম্পর্কে কিছু লেখার সংকল্পবদ্ধ হই। আমার বর্তমান বইটি সেই সংকল্পের বাস্তব রূপ।

আল্লামা ইকবালের কাগজগ্নী মনীষা সম্পর্কে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে কিছু লেখা ধৃষ্টতা মনে হতে পারে। তবুও দু'টি কারণে আমি এ কাজে হাত দিয়েছি। প্রথমত, এ দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার পরিবর্তিত রূপে আরো সুসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নে এগিয়ে আসবেন বলে বিনীত আশা করছি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সাহিত্যমোদীরা ইকবালের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করবেন। এদু'টো আশা আমার প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমত প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থের অভাবে বাধাগ্রস্ত হই। এ বাধা উত্তরণের ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বনামধন্য কবি-সমালোচক আ. ম. ম. বজলুর রশীদ (তিনি বই প্রকাশের সপ্তাহ তিনেক আগে ইন্তেকাল করেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও জনাব আবদুল মুকিত চৌধুরীর কথা। তাঁরা আমাকে কয়েকটি রেফারেন্স বই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিন্তা হলোও সত্যি যে, দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোতে আল্লামা ইকবালের রচনাবলী ও তাঁর উপর রচিত সহায়ক গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রতুল। ফলে শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই বইয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পাইনি। সুখের বিষয় সম্প্রতি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ জাইবুরীতে বেশ কিছু দৃশ্যগোপ্য গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। উক্ত গ্রন্থগুলো থেকে রেফারেন্স নিয়ে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত করার ইচ্ছে রয়েছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক-শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও অনেক কষ্ট স্বীকার করে গাভুলিপিটি আগাগোড়া ধৈর্যসহকারে পড়ে বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। বই প্রকাশের এই শুভ মুহুর্তে আজ তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ তসলিম ও সুবারকবাদ। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের ও দীর্ঘায়ু দান করুন।

বর্তমান খইখানিতে সৈয়দ আব্দুল মান্নান অনুদিত আসরারে খুদী, আব্দুল ফরাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল হক ফরীদী অনুদিত রুমুযে

বেখুদী, মাওলানা তমীযুর রহমান অনুদিত শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, মনীর উদ্দীন ইউসুফ অনুদিত বালে দরার কাব্যানুবাদ গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ।

তথ্য সংগ্রহে যে সব লেখকের বইয়ের সহযোগিতা নিয়েছি তাঁদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের রাহের মাগফিরাত এবং যারা বেঁচে আছেন তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব নূরুল হক (সম্পাদক, আল-ইসলাহ), জনাব মসউদ-উশ-শহীদ, কালাম ভাই, কাশেম ভাই ও ইউনুস ভাইয়ের যে সহযোগিতা পেয়েছি, তা কৃতজ্ঞতার সাথে সমরণ করছি। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমার কাঁচা হাতের লেখা বিধায় কোন প্রকার ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের গঠনমূলক পরামর্শ পেলে বইয়ের মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। বইটি পড়ে সুধী পাঠক-পাঠিকা যদি আল্লামা ইকবালের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও জানতে পারেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃ-পক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও মবারকবাদ জানাই।

সূচী

প্রথম অধ্যায় :	প্রারম্ভিক কথা ॥	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ইকবালের আবির্ভাব : ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ॥	১১
তৃতীয় অধ্যায় :	'সৌভাগ্যে'র সূর্যোদয় ॥	২৫
চতুর্থ অধ্যায় :	বাল্য জীবন ॥	২৮
পঞ্চম অধ্যায় :	শিক্ষা জীবন ॥	৩১
ষষ্ঠ অধ্যায় :	ইউরোপে ॥	৩৮
সপ্তম অধ্যায় :	কাব্য চর্চা ও স্বীকৃতি ॥	৪৯
অষ্টম অধ্যায় :	রাজনীতির ময়দানে ॥	৪৬
নবম অধ্যায় :	পারিবারিক জীবন ॥	৫১
দশম অধ্যায় :	বিদেশ সফর ॥	৫৫
একাদশ অধ্যায় :	মুগ্ধাকারী দর্শন-তত্ত্ব ॥	৫৭
দ্বাদশ অধ্যায় :	জীবন সায়াহ্নে ॥	৬০
ধরিশিষ্ট :	ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি ॥	৭৩
	: বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা ॥	৯৩
	: পশ্চাত্যে ইকবাল-চর্চা ॥	৯৮
	: ইকবাল-রচনাবলী ॥	১০০
	: জীবনপঞ্জী ॥	১০৫
	: গ্রন্থপঞ্জী ॥	১০৮

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক কথা

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসাঁর মহান দিকপাল আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। বিশ্ব-ইতিহাসের এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যুগস্রষ্টা কবি দার্শনিক-এর অবদান সার্বজনীন স্বীকৃতি-ধন্য।

মুসলিম মিফলাতের পরাধীনতার এক দুর্যোগপূর্ণ মুহর্তে এই মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ইসলামী উম্মাহর বিপর্যয় ও হাত-প্রতিঘাতে তখন মহাসংকটকাল চলছিল। উপমহাদেশ তথা এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। নিজেদের মতভেদ ও অমৈত্রির ফলে ভাগ্যবশী শক্তির যড়যন্ত্রে স্বাধীনচেতা এই জাতির ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। ভোগ-বিলাসিতা ও দায়িত্বহীনতার দরুন নেতৃত্বের আসন থেকে তারা দূরে ছিটকে পড়ে—স্তব্ধ হয় দুবিষহ প্রানিময় জীবন।

মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের যুগসঙ্গিকপে কুরআনের ভূমিকা ছিল অনন্য। এটাকে গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনে উত্থান ও পতনের দু'টো প্রোতধারার সৃষ্টি হয়েছে। ইকবাল খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগের অবসান থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিম মিলাতের চরম অধঃপতন ও নাস্তারজনক গোলামীর পেছনে মূল কারণ খুঁজতে নিয়ে এ সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেকাল আর একালের মধ্যে কুরআনের ভিত্তিতেই পার্থক্য সূচিত করেন। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেন :

وہ زبانی معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تہنیں خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

মুসলমানী নিয়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে
আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে।

বিদায় হজ্জের ডায়নে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের বিশাল সমাবেশে ‘বিশ্ব-মানবতার মহাসনদ’ ঘোষণায় বঙ্গ-নির্বোধে বলে-
ছিলেন :

জাহেলিয়াতের সব বিধি-বিধান আমার পায়ের তলে রাখলাম।
..... আমি তোমাদের জন্য দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ
পর্যন্ত তোমরা এদু’টোকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হব
না। এ দু’টো জিনিস হলো—আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সূন্নাহ্‌।

[সিহাহ্‌ সিদ্দা]

কুরআন মুসলমানদের জীবনী-শক্তি। এর বাস্তব অনুসরণের মধ্যেই
তাদের পাখি ও পরকালীন সাফল্য নির্ভরশীল। বস্তুবাদ-জড়বাদ-ভোগ-
বাদের শিকার হয়ে মুসলমানরা অধঃপতিত জাতির দুর্ভাগ্য বরণ করে
সমাজের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে
মুক্তির পথ দেখাতে পারে একমাত্র হেরার রৌণনী—আল-কুরআন। তাই
ইকবাল জাতিকে পথ-নির্দেশ করে বলেছেন :

ای مسلمان گر تو خواعی زیستن

زیست دامن جز به قرآن زیستن

হে মুসলিম! তোমরা যদি জুতল মাঝে

বাঁচতে সবি চাও

কুরআন ছাড়া মুক্তি রুখা

এটা মেনে নাও।

ইকবাল কুরআনের শাস্ত বাণীর আলোকে জীবন্ত জাতির হাত
স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস-বাণীর শুনিয়েছেন :

هم تو مائل به کرم ہیں

کوی مائل تو نہیں

راہ دیکھلائیں کسی راہ رو

منزل ہی نہیں

قرآن عام تو ہے

جوہر قابل ہی لہیں
جس سے تعبیر ہو ان م
کی یہ وہ غل ہی لہیں
کوئی قابل ہو تو ہم
شان کئے دیتے ہیں
دوڑنے والوں کو دنیا
بھی لٹی دیتے ہیں

দান করিতে প্রস্তুত আমি
কিন্তু কেহ প্রার্থী তো নেই
পথ দেখাবো বল কারে
মনষিলের পথিক যে নাই।
শিক্ষা আমার সার্বজনীন
কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
আদম যাতে সৃষ্টি হল,
সেই উপাদান এখন যে নাই।
যোগ্য পেলে রাজার মত
সম্মানিত করি তারে,
তালশ ঘারা করতে জানে—
নূতন জগত দেই তাদের ॥

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে সত্য-ন্যায়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ মু'মিনদেরকে হতাশামুক্ত জীবন ও বিজয় গৌরবের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না। যদি তোমরা মু'মিন হতে পারো, তাহলে তোমরাই বিজয়ী। [মুরা আলে ইমরান : ১৩৯]
আরো ইরশাদ হয়েছে :

أَنَّ الْأَرْضَ بِرِثْهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ -

আমার সৎকর্মশীল (সালেহ) বাপারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

[সূরা আঘিয়া : ১০৪]

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আসনে সমান হতে হলে সর্বাপ্রে প্রয়োজন জ্ঞান, যোগ্যতা, সৃজনশীল প্রতিভা ও অদম্য স্পৃহা। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَعْيٌ -

—মানুষের জন্য চেষ্টা বাতীত কিছুই নেই।

[সূরা নাজম : ৩৯]

الَّذِينَ جَاءُوا فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ -

যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে আমার সাশ্রয়ে অনুগৃহীত করি।

[সূরা আনকাবুত : ৬৯]

ইকবাল আল-কুরআনের উপরিউক্ত বানীর প্রতিধ্বনি করেছেন নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে :

هرَكَ، أَوْ رَأَى قَوْتَ تَخَالُفٍ لِمَسَّتْ

بِشْ مَا جَزَّ كَأَنَّهُ وَ زَلَدِي قَسَتْ

নেই সৃজনী প্রতিভা যার

মোদের কাছে সে কিছু নয়,

কাফির ও যিনদিক, তাহার

আর তো কিছু নাই পরিচয়।

পরাদীন রাষ্ট্রগুলোতে বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসনে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শনের সয়লাবে মুসলমানদের আকৌসা-বিশ্বাসে ঘূর্ণ খরেছিল। নৈতিক অবক্ষয়ের

খস্ নেমেছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। চূড়ান্ত পতনের মুখোমুখি মুসলিম
জাতির দুর্দশা দেখে ইকবাল মর্মবেদনায় জ্বালাময়ী ভাষায় গাইলেন :

شَرُّرْ هے ھو گئی دینا
مے مسلمان نابود
عم یہ کہتے ہیں کہ تھے یہی
کڑوں مسلم موجود
وضع ان تم ھو نصاری
تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ھے جنھیں دیکھ کے
شرمائیں یہود

উঠেছে শোর আজি ধরণী বক্ষে

মুসলিম আর নাহিক' হায় !

তুনে হাসি পায় নাহিক' এখন

কবে মুসলিম ছিল ধরায় ?

রীতি-নীতি তব ঋণ্টান সম,

হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,—

এই কি হে সেই মুসলিম যারে

ইহদীও দেখি লজ্জা পায় ?

পরাদীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে তাগুঠী শক্তির অনুমতি সাপেক্ষে
কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব
যথাযথ আজাম দেয়া যায় না। বরং আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের অবাধ
স্বাধীনতাই ইসলামী খিলাফতের মূল লক্ষ্য। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি কিছু
সুযোগ-সুবিধে দিলেও তাতে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই। উপরন্তু এতে
মুসলমানদের জন্য কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই ডেকে আনে বেশী। ইকবাল
এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

ملا کو اجازت ملی مہ جہ میں

لہاز بڑھنے کی

الافق سجدتا ہے کہ
یہ دین کی آزادی

ইমাম সাহেব মসজিদে পান
নামায পড়ার অনুমতি,
মুখেরা ভাবে দীনের আযাদী
এতেই বাগবাগ অতি।

মুসলিম মিষ্টান্তের এ উদ্বেগজনক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন
আরও হৃদয়গ্রাহীভাবে নিম্নোক্ত কবিতায় :

ہاتھ لے زور ہیں الحاد سے
دل خوگر ہیں
امتی باعث رسوائی
ہوئے بر ہیں

বাহ তোদের শক্তিহীন আর
নাস্তিকতায় প্রাণ উত্তলা
নবীরও যে লজ্জা আসে
তোদেরে উদ্ভতী বলা।

এভাবে আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির আত্মসচে-
তনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর উদাত্ত আহবানের ধ্বনি বিশ্বের
মুজ্জিকামী জনতার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে।

ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে ইকবাল মানব-চরিত্র
গঠনের স্বপ্নটি ছিলেন। আতিসত্তার আদর্শিক দিকটি বিশেষভাবে পূনর্গ-
ঠনে ছিলেন তিনি আপোষহীন। ইকবালের দৃষ্টিতে 'ইনসানে কামিল'
হচ্ছেন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। নিম্নোক্ত কবিতা-পংক্তিগুলোতে তিনি
ইনসানে কামিলের চরিত্র চিত্রণ করেছেন :

هاتھ ہے اللہ کا بندہ ، دوسن کا ہاتھ
 غالب و کار انورین کا کشاکش ساز
 خاکی و نیروی نهاد بندہ مولا صفات
 ہر دو جہاں غنی اسکی دل بے نیاز
 اسکی ابدین قلیل اسکی مقاصد جاہل

মুমিনের হাত যেন আল্লাহর হাত
 তিনি বিজয়ী, চারিত্রিক মাধুর্য্যায় রয়েছে তাঁর সূখ্যাতি,
 তিনি সাহসী, সুদক্ষ নির্মাতা ও সৃষ্টিধর্মী,
 মানুষ হয়েও ফিরিশতা চরিত্রের অধিকারী
 মহান প্রভুর গুণে গুণান্বিত।

উভয় জগতের লালসা থেকে তাঁর হৃদয় মুক্ত
 তাঁর সাধ আশা স্বল্প, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য উচ্চ।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

‘এই নায়েব—ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানুষ) শুধু আল্লাহর প্রকৃত
 খলীফা নন, বরং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ
 খুদীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি, তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ
 শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনিই এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক
 এবং তাঁর রাজ্যই দুনিয়ায় আল্লাহর রাজ্য। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর
 গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, জ্ঞান-শক্তির অধিকারী এই
 এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর রাজত্ব
 কায়ম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।’

ইকবালের লেখনীতে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত জাতির প্রাণে স্পন্দন জেগেছে।
 গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ জাতির ঘোর অমানিশা দূরীভূত করে উষার
 আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের অসারতা ও ইসলামী
 দর্শনের কার্যকারিতা প্রমাণের মত দুরাহ কাজে ইকবাল সার্থক অবদান
 রেখেছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগের আলোকে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের
 চেষ্টনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

ইসলামের যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ডায়ের উপস্থাপনার প্রয়োজনে আল্লামা ইকবাল ইসলামের কালজয়ী জীবন-দর্শনের রূপরেখা শিল্পিত অবয়বে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেন। তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য দর্শনের চাকটিক্য শূন্য হয়ে পড়ে। ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক মূল্য-বোধ নতুনভাবে তার বৈশিষ্ট্যের ঘোষণায় সোচ্চার হয়—ভাগ্যাহত জাতির জীবনে এক যুগান্তকারী নবজাগরণের সূচনা হয়।

বিংশ শতকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলিম মিল্লাতের জীবন-প্রবাহে যে উদ্দীপনা ও প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, তার গোড়ায় রয়েছে ইকবালের কাব্য-ঝংকার। মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে তিনি সমাজের স্তরে স্তরে যৌবনের জলতরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাণীতে ছিল আশা-উদ্দীপনার দীপ্তি, সুরে তাঁর দীপকের ঝংকার।

রসুল (সঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানা—অনুপম আদর্শের অনুসরণের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া জেগেছে মুসলিম জাহানের সর্বত্র তথা সারা বিশ্বে। মানবতার মূল্যবোধ সজীবিত হয়েছে তার মননগীর্ন সাহিত্য সাধনায়, তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে জন্ম দিয়েছে এক বিপ্লবী নব জাগরণের। দীপ্ত চেতনায় জেগে ওঠেছে ধ্বংসের উত্তর—সর্বশ্রেষ্ঠ কওমের মুক্তি-পাগল সন্তানরা।

‘খুদী’র জাগরণের আহ্বান ছিল তাঁর কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপর্যস্ত মানবতার সংকট মুক্তির প্রয়াসে তাঁর কাব্য দর্শনে রয়েছে উন্নততর জীবন বোধের সন্ধান। তিনি জাতির কাছে নিবেদন করেছেন :

‘খুদী’র জোরেই মুসলমানের

ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ,

‘খুদী’ই যদি যায় হারিয়ে

তাহলে সে অন্যের দাস।

আজকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আমরা ইকবালের কাছে চির ঋণী। বিশ্ব মুসলিমের সংহতি, পুনর্জাগরণ এবং নব উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা প্রয়াতীত। আসন্ন নব জাগরণ ও তাওহীদের উত্থান তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ঘোষণা করেছেন :

شب گریزان ہو گئی آخر
جاوے خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا
لغۃً تو جہد سے

উষার আলোয় রাঙলো আকাশ
তিমির কুহেলী রজনী যান্ন,
এবার চমকে তাওহীদি গান
অংকুত হবে ভোরের বায়।

যুগে যুগে অনেক প্রথিতযশা মনীষী ও বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা অধঃপতিত জাতিকে সত্য-ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বাধা সেধেছিল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি। তারা এসব মনীষীর উপর চালিয়েছিল অত্যাচারের স্টীম-রোলার—অকথ্য নির্যাতন ও অপবাদের প্রচারণা। তবুও তাঁদের মিশন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। আল্লামা ইকবালও তাঁর সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে মিল্লাতের নব জাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন :

چاک اس بلبل تنها کی لوائے دل ہوں
جاگنے والے اسی ہانگہ درا سے دل ہوں
یعنی بھر زخم نشے عہد وفا سے دل ہوں
بھر اسی بازو دیرینہ کے ہوا سے دل ہوں
عجمی خم ہے تو کیا مئے تو حجازی ہے مری
لغۃ ہندی ہے تو کیا لئے تو حجازی ہے مری

বুলবুলির কুহতানে হয়তো
হৃদয় আবার দীর্ঘ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পখিক
জাগবে আবার ঘণ্টারবে।
ওফাদারীর অনুরাগে
প্রাণটি আবার উঠবে জেগে,

পূর্ব-সুরা পান করতে
 মনটি আবার ব্যস্ত হবে।
 আজম দেশী পান্ন হলেও
 সুরা আমার আরব দেশী,
 গান যদিও হিন্দী আমার
 সুরাটি সেই হেজাজ দেশী।

আজকের বিশ্বের প্রায় সোত্তা শ' কোটি মুসলমান তাওহীদের জীবনবাদে উদ্দীপ্ত। আল্লামা ইকবাল এই জাগরণের ধারাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অনাগত বনী আদমের উদ্দেশ্যে আলোর পথের দিশা দিয়ে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি যুগ-যুগ ধরে তাওহীদি জনতার হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। জাতিও তাঁর কাছে চিরঞ্চনী থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইকবালের আবির্ভাব : ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের এক কৃতি সন্তান। বিভাগ-পূর্ব ভারতে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান। বিশ শতকের ইসলামী নবজাগরণের তিনি সিংহাসনার এবং কাব্য ও দর্শনের জগতে ছিলেন পূর্বসূরীদের চিন্তা-ধারণার সার্থক রূপকার। ইসলামের শাস্ত আদর্শ জাতির কাছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যে সুনিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিলো যুগের দাবী ও অতীতের প্রেরণা সজ্জাত। তিনি নিজেই বলেছেন :

সামনে রাখতা হৌঁ উস্ দণ্ডের নশাত আফসা কো মায়
দেখতা হৌঁ দণ্ড কি আয়নে মে ফরদা কো মায়

বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভরা অতীত আমার সামনে রাখি
গতকালের আসিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।

মনবী আল-ফারাযী বলেছেন :

‘ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক হিন্ন হওয়ার পর জাতির জ্ঞান মূর্খতায় রূপান্ত-
রিত হয়।’

ইকবালের জীবন ও কর্ম আলোচনার আগে স্বাভাবিকভাবেই উপ-মহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রেক্ষাপট এবং মুসলিম উম্মাহর পথ পরিষ্কার উপর আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। এতে ইকবালের আবির্ভাব-পূর্ব ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

এক

আরব সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী ভারত উপমহাদেশ ও পশ্চিম উপ-কূলবর্তী আরব দেশের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সম্পর্ক বিদ্যমান। আরব বণিকরা বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইসলামী সপ্তম শতকে মহানবী (সঃ)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে যে অনুগম বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তার তরঙ্গাভিঘাত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। অল্প কালের মধ্যেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আলোকছটা ভারত বর্ষেও এসে পৌঁছে।

খিলাফতে রাশেদার যুগে আরব বণিকরা ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। ৬২৬ খৃঃ একটি আরব জাহাজ একদল বণিক-মুবাঞ্জিগ নিয়ে ওমান উপসাগর থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূল তানাহ্-এ এসে পৌঁছে। বণিক-মুবাঞ্জিগরা পার্শ্ববর্তী এলাকা মালাবার ও সিন্ধুতে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের সহযোগিতায় রসুল্লাহ (সঃ)-এর বেশ কয়েকজন সাহাবাও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। কথিত আছে—হযরত আদম (আঃ) বেহেণত থেকে বহিষ্কৃত হলে তাঁকে ভারতবর্ষের সিংহলে রাখা হয়। তাঁর পদচিহ্ন দর্শন লাভের জন্য সুদূর আরব দেশ থেকে কোতুলী মুসলমানরা সিংহলে আসতেন। আর এভাবে আরবীয়দের সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

কালিকটের হিন্দু রাজা 'জামোরিন' জনসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবাসী ইসলামের শাস্ত্র আহবানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সন্তানুসন্নিহ্ন জনগণ কলেমা তাওহীদে ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। এ সব নব বাস্তব আত্মপ্রাণ মুসলিমরা নাবিকের চাকরি গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ডঃ এ. এম. হুসাইন লিখেন : 'মালাবারের শেষ হিন্দুরাজা চেরা-মান পেরুমল স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মালাবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।' ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, কয়েক দশকের মধ্যেই মালাবারে ১১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের এই ব্যাপক প্রসারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে টমাস আর্নল্ড লিখেছেন : ইসলামের সুমহান আদর্শ ও উদার নীতি, ইসলাম প্রচারকদের সহজ-সরল জীবন স্থাপন পদ্ধতি, নির্যাতিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং সূফী দরবেশদের মানব-প্রীতি ও সেবা বর্ণ প্রথায় জর্জরিত ভারতীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দ্বাদশ শতকের শুরুতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর অভিযান উপমহাদেশে প্রেরিত হয়। এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তাঁর নেতৃত্বে সিন্ধু-বিজয়ের (৭১১ খৃঃ) পর সিন্ধু ও মূলতানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে আকস্মিকভাবে অপসারিত হন এবং শাহাদত বরণ করেন। তবুও তাঁর সোয়া তিন বছরের শাসনামলে মুসলমানরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক

অর্থোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও সুগম হয়।

সিন্ধু বিজয়ের আড়াই শত বছর পর তুর্কী মুসলমানরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নেন। তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনির আমীরুল উমরা সবুজগীন (৯৭৭-৯৯৭ খৃঃ) ভারতবর্ষে পর পর দু'বার সমরান্ধি-যান পরিচালনা করে হামদান ও পেশোয়ার পরাভূত তুর্কী সাম্রাজ্যের বিজুতি ঘটান। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে সমরান্ধিযানের নতুন পথ প্রদর্শক।

ইসাব্দী ১০০০-১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ তাঁর রাজত্বকালের ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষ অভিযান চালিয়েছিলেন। এতে ভারত বর্ষে মুসলিমদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটে। ইসাব্দী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার কার্যে বহু সংখ্যক সূফী-সন্ন্যাস-মুজাহিদ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—খাজা মঈনুদ্দীন চিগতী (রঃ) শেখ জ্বালাল উদ্দীন তাবরিষী (রঃ), ফরীদ উদ্দীন গাজে শকর (রঃ), নিজাম উদ্দীন (প্রকৃত নাম মুহাম্মদ) আউলিয়া (রঃ), বাবা আদম শহীদ (রঃ) ও শাহজালাল (রঃ) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গজনি বংশের পতনের (৯৬২-১১৮৬ খৃঃ) পর ঘোরী রাজবংশ (১১৮৬-১২০৬), মামলুক বংশ (১২০৬-১২৯০ খৃঃ), খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খৃঃ), সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫৯ খৃঃ), লোদী বংশ (১৪৫৯-১৫২৬ খৃঃ), ভারতবর্ষে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এর পর দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে। শুরু হয় মোগল শাসনামলের।

১৫২৬ খৃঃ সম্রাট জহির উদ্দীন বাবর ইবরাহীম লোদীর সাথে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনামল। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরাট প্রভাব বিস্তার হয়। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পে তারা চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

মোগল বাদশাহ আকবর ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধনের জন্য অভিনব প্রয়াস চালিয়েছেন। 'দীন-ই ইলাহী' নামে তিনি এক নতুন তথাকথিত 'ধর্ম' পেশ করেছিলেন। এটা ছিল ইসলামের মূলে কুঠারাবাত স্বরূপ। ইসলামী বুদ্ধিজীবী তথা আলিমরা আকবরের এই হীন

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। দেশ বরেন্দ্র আলিম, সিংহ-পুরুষ শেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) এই ঘোর দুদিনে এ নব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সরল গ্রাম মুসলমানদেরকে বিগ্রাতির কবল থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে তিনি জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের কারণে তিনি কারাবরণ ও অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে সমুদ্রত রাখার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বস্তুত এটা ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী আন্দোলন।

শেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) রাজা-বাদশাহদের ইসলাম-বিরুদ্ধ কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা করতেন। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর এ অবদানের জন্য তিনি মুজাফ্ফিদ-ই-আলফেসানী বা দ্বিতীয় সহস্র বর্ষের সংস্কারক-এর মর্যাদা লাভ করেছেন।

সম্রাট মহীউদ্দীন আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর ভারতবর্ষের শাসনকার্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী। আলম-গীর-জিন্দগীর নামে খ্যাত ছিলেন। বিশ্ব-মুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি উপমহাদেশের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। মক্কা, পারস্য, বুখারা, বলখ, আবিসিনিয়ার সুলতান এবং বসরা, ইয়েমেনের শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণের আশ্বাস জানান।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ—শিরক-বিদ'আত, মদ ব্যবসার মূলোৎপাটন করেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ করেন। রসুলে করীম (সঃ)-এর প্রতি কটুতির দায়ে হুসাইন মালিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের নির্ভর-যোগ্য গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' রচিত হয়।

১৭০৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর ভারত বর্ষের দৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শোচনীয় অবসান ডেকে আনে। তাঁর জীবদ্দশায়ও মারাঠা শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের আতংক ছিল। এদের প্রতিহত করতে তাঁকে বেশীর ভাগ সময়ই বাস্তব থাকতে হয়েছে। মারাঠা নেতা শিবাজী ও শজুজী তাদের বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের বেশ কিছু এলাকা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অন্যদিকে সম্রাটের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময়

পারস্য থেকে নাদির শাহের (১৭৩৮খৃঃ) আক্রমণ মোগলদের শেষ শক্তির উপর চরম আঘাত হানে পৰ্ব্বদস্ত করে দেয়। হাযার-হাযার মুসলমান এতে শহীদ হন।

দিল্লীর শাহী দরবারে আমীর উমরাদের-আদালত, যড়যন্ত্র ও ক্ষমতার স্বস্তির সুযোগে বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মারাঠা-রাজ ও ইংরেজ কোম্পানীর কীড়ণকে পত্রিগত হয়ে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীর নাম মাত্র শাসন পরিচালনা করতে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতার ফলে প্রদেশগুলো স্বাধীন রাজ্যে রূপ নেয়। ১৭৬০ সালে মারাঠারা দিল্লী অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে।

এ সংকটময় মুহূর্তে বিপ্লবী সংস্কারক, চিন্তানায়ক ও শতাব্দীর মুক্তির দিশারী, বাগী-লেখক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) (১৭০০-১৭৬৩) আবির্ভূত হন। মুসলিম উম্মাহর এ শোচনীয় পতনের বেদনা-দায়ক পরিস্থিতিতে তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলমানদের নিপ্পুণ শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটে। মক্কা ও মদীনা সফর করে তিনি বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রেরণা লাভ করেন। ১৭৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করেন এবং স্বদেশে সংস্কার বিপ্লবের দৃঢ় প্রত্যয়ে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতকের বিপ্লবী সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) (১২৬৩-১৩২৮)-এর চিন্তাধারা-প্রভাবিত যোগ্য উত্তরসূরী।

তাঁর সম্পর্কে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরক লিখেন :

‘শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ) বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ধারা অনুসরণ করে ইসলামের মূলনীতিগুলোকে সুসম্বন্ধভাবে প্রকাশ করেন। এতে এক দিকে যেমন ইসলামের মূলতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে, তেমনি অপর দিকে ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিরও সুবিন্যস্ত আলোচনা রয়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে মুসলিম রাজত্বের অবসানের সূচনা থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর অবদানই মুসলিম সমাজের একমাত্র দিশারী ছিল। সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে শাহ ওয়ালী উল্লাহর ভাবধারায় উদ্ভূত হয়েই সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাইল দেহলভী (রঃ) মুজাহিদিন আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।’

মক্কায় অবস্থানকালে একটি বিশেষ স্বপ্নের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ

করেন। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুসলিম রাজত্বের হুমকি—মারাঠা শক্তি দমনের সিদ্ধান্ত নেন। অমিততেজা আফগান শাসক আহমদ শাহ্‌র আবেদন আলীকে মারাঠাদের মূলোৎপাটনের জন্য অভিযান পরিচালনার আহ্বান জানান।

আহমদ শাহ্‌র আবেদন আলী ১৭৩৮ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত মোট নয় বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্চমবারের আক্রমণে (১৭৫৯—৬১) মারাঠাদের সাথে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ৭১ দিন উভয়পক্ষের সৈন্য বাহিনী মুখোমুখি থাকে। ১৭৬১ সালের ৬ই জানুয়ারী মারাঠাদের আকস্মিক আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য বাহিনী ও অনন্য যুদ্ধকৌশল সম্পন্ন সেনাবাহিনী মারাঠা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। প্রায় ২ লক্ষ মারাঠা এতে নিহত হয়। আবেদন আলীর এ দুর্ধর্ষ আক্রমণে ভারতবর্ষ মারাঠা-আগ্রাসন মুক্ত হয়। ফলে মুসলিম শাসকদের এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। ১৭৬৩ সালে শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (রাঃ)-এর ইচ্ছাকালে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বে অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়। ভারতের রাজনৈতিক গতিধারা অন্যদিকে মোড় নেয়।

নাদির শাহের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় মুসলমানরা এবং আহমদ শাহ্‌র আবেদন আলীর আক্রমণে উৎখাত হয় মারাঠারা। ভারতবর্ষের এ দু'শক্তি-ধর জাতির বিপর্যয়ের সুযোগে দুর্ধর্ষ শিখ জাতির অভ্যুত্থান ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা লোলুপতার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কোম্পানী প্রাসাদ ষড়-যন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ইচ্ছন যোগাতে শুরু করে। মোগল বংশের শেষ কয়েকজন বাদশাহ্‌র রাজত্বকালে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের বাগিচা-কৃতি। এগুলো মূলত ষড়যন্ত্রের আখড়া হিসেবে কাজ করতো।

মোগল বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লীর সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য ছিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ বঙ্গাব্দের যুদ্ধে শাহ্‌ আলম ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে বন্দী হন। এ সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাৎসরিক রাজস্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে।

অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বৃটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। তাদের ক্ষমতার মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকার মীর জাফরকে প্রথমেই কোম্পানীর কাছে প্রতিশ্রুত দেড় কোটি টাকার অধিক পরিশোধ করতে হয় এবং একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকার সম্মতি দিতে হয়। মীর জাফর কোম্পানীর প্রাপ্য পুরো টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে দরুন দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে এদেশের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়। স্বাধীন দেশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য বিস্তার শুরু করে।

মহীশূর রাজ্যের ন্যায় পরায়ণ শাসক হায়দর আলী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতানও ইংরেজ চক্রান্তের শিকার হন। ১৭৯২ সালের একটি যুদ্ধে হায়দর আলী পরাজিত হন এবং ১৭৯৯ সালে সৈদাশিরের প্রান্তরে বীর টিপু সুলতান ইংরেজদের সাথে এক যুদ্ধে শাহাবত বরণ করেন। মহীশূর ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্থভূক্ত হলো। সারা ভারতে এ ধরনের স্বাধীন রাজ্য ও ইংরেজ বিরোধী শক্তি পদানত হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তারা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। ক্ষমতার দর্পে শুরু হয় শাসনের নামে শোষণ, শক্তি স্থাপনের নামে দমন নীতি।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার-এর লেখনীতে এ সময়কার নিরীহ ও সর্বহারা মুসলিম রায়তবর্গের করুণ চিত্র ভেসে ওঠেছে। তিনি লিখেছেন : ‘গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলিম পরিবারগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুবা ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন বিস্তারালী সমাজের নীচে চাপা পড়ে যায়।’

মুসলমানদের শৌর্ধ-বীর্ষ সম্পর্ক তারা খুবই সচেতন ছিল। তাই গোড়া থেকেই মুসলমানরা তাদের চক্ষুশূল ছিল। ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরণে মুসলিম-স্বার্থ দারুণ ভাবে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো।

১৮১৭ সালে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। সেখানে মুসলিম ছাত্রদের ভর্তির কোন সুযোগ ছিল না।

১৮২৮ সালে নিকর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন জারী করা হয়। এর ফলে এসব সম্পদের আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্রাসা-মক্তাব, খানকাহ-এতিম-খানা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। ইসলামী শিক্ষা বহুরে চক্রান্তের পাশাপাশি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ বেনিয়াদের শাসন-শোষণ, জমিদার-মহাজনদের নির্যাতন-নিপীড়ন, আমলাদের দৌরাখ্য অত্যাধিকৃতাবে বেড়ে যায়। অন্যদিকে এই নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণী—মুসলমানরা নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়। শিরক-বিদ-‘আত, পীর পুজা ও কবর পুজায় দেশ ছেয়ে যায়। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সামাজিক দুরাবস্থা তাদেরকে শ্রুতি অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক আকাশে মহা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছিল।

নির্যাতিত জাতি যাবতীয় গশ্চাদপদতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে সংগঠিত হতে শুরু করে। এগিয়ে এলেন সমাজ সংস্কারক বীর সেনানী হাজী শরীফ উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। সামগ্রিকভাবে পুণর্জাগরণের সূচনা হয়। দুর্জয় সৈমান ও তেজোদীপ্ত সাহস নিয়ে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, স্বাধিকার আদায়ের পুণ্ড্র প্রত্যয়ে শীসা-চালা মহা প্রাচীর গড়ে তোলে। পরাধীনতার জিজীর ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বর্জন এবং একনিষ্ঠভাবে রসুল (সঃ) প্রদর্শিত জীবন দর্শনের অনুসরণের জন্য দেশবাসীকে আহবান জানান তিনি। ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসিত ভারত বর্ষকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা দেন।

১৭৯৯ সালে তিনি হজ্জ পালন করতে যান। মক্কা-মদীনার কাটিয়ে-ছেন একাধারে বিশ বছর। সেখানে তিনি প্রথিতযশা মনীষী ও হানাফী মযহাবের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শেখ তাহির আস্ সাহাালের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। হাজী শরীফ উল্লাহ তাঁর কাছে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর মন হেরার রওশনীতে ঝলমল হয়ে ওঠে, জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে চিন্তা-চেতনা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘর বানুতুল্লাহর কাছে বসে তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন ভারতবর্ষের অধঃপতিত মুসলমানদেরকে তাওহীদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে

গোলামীর শিকল ছিন্ন করবেন। ইসলামের ফরযিয়াত যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরুন্মুখ ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবেন।

১৮১৮ সালে স্বদেশ ফিরে তিনি এক ব্যাপক-ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দেন। এ আন্দোলনের নাম ছিল ফরায়েজী আন্দোলন। তিনি অসীম ভাগ-ভিত্তিকা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁতী, কল ও কৃষক-মজুর ছিল এ আন্দোলনের দুর্জয় সৈনিক। অন্যদিকে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শক্তি ছিল এর বিপক্ষে। অল্প দিনের মধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলা এ আন্দোলনের দুর্গ হিসেবে গড়ে ওঠে।

আন্দোলনের দুর্বীর গতি দেখে ইংরেজ সরকার অশনি সংকেত শুনতে পায়। তাদের ভবিষ্যৎ-বিপদ ঠেকাবার জন্য কূটকৌশল শুরু হলো। ১৮৩১ সালে কান্ধেমী স্বার্থবাদী জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে ফরায়েজী আন্দোলনের সমর্থকদের এক দাপা সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এর ছুতো ধরে সত্ৰাসী তৎপরতার অভিযোগ এনে হাজী শরীয়ত উল্লাহকে গ্রেফতার করে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। লৌহ শবনিকার অন্তরালে নির্মম নির্যাতন চালান তাঁর উপর। কিছুকাল পর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীতে এ আন্দোলনের ভার পড়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া'র উপর।

বাংলার বৃহৎ ফরায়েজী আন্দোলনের পাশাপাশি সমসাময়িক কালে আর একটি ব্যাপক আন্দোলন সূফী সাধক মুজাহিদে মিল্লাত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) (১৭৮৭-১৮৩১) এর সুযোগ্য নেতৃত্বে জিহাদী আন্দোলন। ইতিহাসে এটা 'মুজাহেদীন আন্দোলন' নামে সমধিক পরিচিত। ১৮২৬ সালে তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এ বছর ২১ শে ডিসেম্বর আকরা যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ বাহিনী শিখ সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে ইংরেজ-মসনদ কাঁপিয়ে তোলে। ১৮৩০ সালে সেনাপতি শের সিং-কে পরাজিত করে পেশোয়ার দখল করেন। এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড-ভিত্তিক একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বুনিন্দা পত্তন করেন। এ প্রজাতন্ত্রের শাসন পদ্ধতি ছিল রসূল (সঃ) ও খলাফায়ে রাশেদার আদর্শের অনসরণে।

ইংরেজ সরকার এ নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর চরম আঘাত হানে। সুসংগঠিত মুসলিম শক্তিকে চিরতরে উৎখাত করার জন্য যড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। শিখরা ইংরেজদের সাথে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ফলে অকালে এই শিশু রাষ্ট্রটির পতন ঘটে। ১৮৩১ সালের মে মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। সৈয়দ আহমদ বেরগভী তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শাহ ইসমাইল (রঃ) সহ বেশ কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে এ জিহাদে শাহাদত লাভ করেন।

সৈয়দ আহমদ বেরগভী (রঃ) যখন মুজাহেদীন আন্দোলনের সূচনা করেন, বাংলাদেশে সমসাময়িক কালে সিংহ পুরুষ সৈয়দ নিসার উদ্দীন ওরফে তিতুমীর ইংরেজ বিরোধী 'মোহাম্মদী' আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮১৯ সালে তিনি হুজ্বা পালন উপলক্ষে মন্ডায় অবস্থান কালে সৈয়দ আহমদ বেরগভী (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুসলিম উম্মাহর পরাধীনতার গ্লানি দূর করার জন্য উভয়ের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিতুমীর সৈয়দ আহমদ বেরগভীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। দেখে ফিরে তিনি প্রথমত হিন্দু জমিদারদের জুলুম-উৎপীড়ন থেকে নিরস্ত মুসলিম কৃষকদের মুক্তির লক্ষ্যে একটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের জন্ম দেন। ধর্মপ্রাণ কৃষকদের দাঁড়ির উপর নির্ধারিত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এটা প্রত্যাখ্যান করার ডাক দেন। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিয়দংশে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে ইংরেজ সরকারের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাড়ে। ইতিহাসের করুণ পরিণতিতে তিতুমীরও ১৮৩১ সালের ১৪ ই নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেব্জার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

১৮৩৫ সালে শিচ্কা পদ্ধতি সংস্কার করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিচ্কা দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৮৩৭ সালে আদালতে ফাসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে মুসলমানরা শিচ্কা-সংস্কারের দিক থেকে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। কারণ তারা গোড়া থেকেই ইংরেজ সভ্যতা ও ইংরেজী ভাষাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে আসছিল।

১৮৪৭ সালে বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তন করে মুসলমানদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর প্রদত্ত জায়গীর

ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদের সাথে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। মুসলিম আইনের সঙ্গে ব্রিটিশ আইন প্রবর্তন করে মুসলিম শক্তিকে একেবারে কোণঠাসা করে দেয়া হয়। মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র অংকন করে ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার ও এইচ. সি. ব্রাউন যে হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন, তা এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য বলে মনে করি।

‘মাঝে মাঝে মুসলমানরা তীব্র জাতীয়তার মনোভাব ও যুদ্ধ বিগ্রহে দক্ষতা প্রদর্শন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।’

[উইলিয়াম হান্টার : দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্]

হিন্দুরা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, ২৪০ জন দেশীয় আইনজীবীর মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। [এইচ. সি. ব্রাউন]

দিল্লীতে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ সাল) রাজত্ব করছেন। তিনি ছিলেন মোগল বংশের শেষ সম্রাট। ইংরেজ শাসনের ষাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণ স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলনের ডাক দেয়। ইংরেজ আধিপত্য নির্মূল করার লক্ষ্যে সিপাহিগণ ১৮৫৭ সালে সুসংবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু এ আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা সুকৌশলে বাহাদুর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে বাম্যায় নির্বাসন দেয়। এভাবে উপমহাদেশে প্রায় সাড়ে তিন শো বছরের মোগল শাসন আমলের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলমানরা আরো দ্বিগুণভাবে ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে। কারণ ইতোপূর্বেও সংঘটিত সব ক’টি বিপ্লব-আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানরা একটি অবাঞ্ছিত ও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত জাতির ভবিষ্যৎ বঞ্চনা ও হত্যাশার অন্তর্লগন্বরে নিমজ্জিত হয়। এ সংকটকালে জাতির দিশারী হিসেবে এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) ও নওয়াব আবদুল জতিফ (১৮২৮-১৮৯১)।

৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবের জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করা হলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডেপুটেশন প্রেরণ করেন। তিনি

The loyal Muhamedans of India বইটি লিখে মুসলমানদের দোষ স্থাননের চেষ্টা করেন এবং The Causes of Indian Mutiny বইয়ে এসব স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতিকে দায়ী করেন।

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যতীত পশ্চাদপদ জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে মুসলমানদের সংযোগ সাধনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। আলীগড়ে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেন। এটার নাম ছিল 'লিটারেরী এণ্ড সাইন্টিফিক সোসাইটি।' ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ট্রান্সলেশন সোসাইটি।' এ সংস্থার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বই অনূদিত হয়। তাঁর একান্ত স্বপ্নসাধ ছিল কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মত একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘকাল আন্দোলনের মাধ্যমে সেই সাধ বাস্তবে রূপ নেয়। ১৮৭৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান গ্রাংগো ওরিয়েন্টাল কলেজ।' কিছুকাল পর এটা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত হয়। কালক্রমে এটা উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রধান ও সর্বোচ্চ বিদ্যাকেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। এ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার বোধ্য নেতৃত্বসম্পন্ন অনেক মহান ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠান জন্ম দেয়।

সমসাময়িক কালের ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব হুসেন নওয়াজ আবদুল জতিফ (১৮২৮-১৮৯১)। তিনি ছিলেন মুসলিম বাংলার পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের প্রথম মুসলিম সদস্য। ১৮৮৫ সালে ভূপালের নবাবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতবর্ষের নির্যাতিত মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জাতির হীনমন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে তাঁর সুদূর প্রসারী কর্মসূচী অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি গঠন করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেন। এ সংগঠন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকারের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপমহাদেশে ইসলাম

ও মুসলিম উত্থার সূচনা ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস গেশ করেছি। এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো—শেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) থেকে ৫৭-এর বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী পর্যন্ত সবাই হজ্জ পালন শেষে ফিরে এসে অনৈসলামী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁদের আন্দোলন ছিল গায়রুল্লাহর সাথে আপোষহীন। এ পর্যন্ত সব আন্দোলন মুনাফিকদের কারণে ব্যর্থ হলে মুসলমানরা সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত মরণ পণ নিয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালান।

বিপ্লব পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ মনীষীকে আমরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতামূলক নীতির সাথে আন্দোলন পরিচালনা করতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া তখন কোন গত্যন্তরও ছিল না। এভাবে সংগ্রাম মুখর দীর্ঘ এক হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলিম জাতিকে একটি অজৈয় জাতি হিসেবে দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মুসলিম জাতি ইতিহাসের এক বিশেষ যুগ সজ্জিক্রমে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এক কর্ণধারের। ১৮৭৭ সালে আলীগড় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা হয়, তা ধরে রাখা এবং জাতিকে স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জীবিত করার মহান দিশারী হিসেবে স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তপনাত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল।

দুই

গাজাবের উত্তরে কাশ্মীর। শিখ নয়নাতিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন এই কাশ্মীর। ‘ভূ-স্বর্গ’ হিসাবে এটা সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সবুজ গাছ-গাছালি, রঙ-বেরঙের ফুল আর সুমিষ্ট ফলে ভরপুর এ শহর। লীলাময়ী প্রকৃতি যেন এখানে মুক্ত হস্তে সৌন্দর্য ও মাধুর্য দান করেছেন।

প্রায় এক হাজার বছর আগে এ এলাকায় কুরআনের আলো পৌঁছে। আরব, ইরান ও তুর্কিস্তান থেকে মুসলিম বণিক ও মুবাগ্নিগরা এখানে ইসলামের আহ্বান নিয়ে আসেন। তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনা ও ত্যাগ তিতিকার বিনিময়ে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। তখন কাশ্মীরে হিন্দু রাজাদের রাজত্ব চলছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এটা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা।

ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলিমদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও প্রেণী বৈষম্যে জর্জরিত জনগণ হেরার রওশনীর সুমহান ভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দীনে হকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এভাবে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চললো। পরবর্তীতে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের দ্বারা কাশ্মীর বিজিত হলে ইসলামের আরও প্রসার ঘটে।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে কাশ্মীর পাঠানদের কাছ থেকে মোগল রাজত্বের অধীনে এলো। পাঠানরা আবার মোগলদের হাত থেকে কাশ্মীর দখল করে। জনগণের সাথে পাঠানদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে জনগণ। অন্যদিকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এতে হাযার-হাযার লোক অনাহারে মারা যায়। এ সুযোগে শিখরা কাশ্মীর দখল করে নেয়। আবার অত্যাচার শুরু হলো। কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অশান্তির আশ্বন ধরলো। দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলার দারুণ অবনতি ঘটলো। শান্তিপ্ৰিয় মানুষ দলে দলে পার্শ্ববর্তী শহরে চলে যেতে লাগলো। সেখানে গিয়ে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এর মধ্যে অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরের পাশেই সিয়ালকোট। এখানে কাশ্মীর ছেড়ে আসা পরিবারগুলোর বসবাস শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছিল এ শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা বাবসা বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। নাগরিক জীবন ছিল সুখময় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর থেকে আগত সিয়ালকোটের একজন শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাঁর পরিবারসহ ইসলাম কবুল করেন। এক সুফী দরবেশের সংস্পর্শে এসে তাঁরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সিয়ালকোটের মুসলমানরা ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন অটল। আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ে মুকাবিলা করতেন। তার প্রমাণ মিলে ১৮৩৯ সালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর জিহাদী আন্দোলনে তাঁদের সর্বাঙ্গিক অংশ গ্রহণে।

তৃতীয় অধ্যায় 'সৌভাগ্যে'র সুখোদয়

সিয়ালকোটে বাস করতেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুয়ুর্গ ব্যক্তি। সর-কারী চাকরি করতেন তিনি। জনগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। আলেম-বুয়ুর্গদের সাথে ছিল তাঁর হৃদয়তাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হর-হামেশা দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহর বাণী ও রসুলের হাদীস নিজে যথাযথভাবে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন সিয়ালকোটের ইসলাম গ্রহণকারী সেই অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরসূরী। তাঁর নাম শেখ নূর মুহাম্মদ।

পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে শেখ নূর মুহাম্মদ সিয়ালকোটের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন তিনি। সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ নির্যা-তীত জনগণের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করতো। অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর পরিবারটি এলাকার মধ্যে 'শেখ পরিবার' হিসেবে বেশ সুপরিচিত ছিল। পারিবারিক উপাধি ছিল 'সগরু'।

একদিন গভীর রাতে শেখ নূর মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেন—একটি ধবধবে সাদা কবুতর মনের আনন্দে আকাশে ওড়ছে। কবুতরটি দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছে জাগে কবুতরটি পাওয়ার। হাত বাড়ালেন এটা ধরার উদ্দেশ্যে। তা এতো উপরে যে, হাতে নাগাল পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কবুতরটি নীচে নেমে এসেছে। একে-বারে মাথার উপর। একটু পরে তিনি দেখলেন, তাঁর কোল জুড়ে বসে পড়েছে। কবুতরটি পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা।

সকাল বেলা তিনি স্বপ্ন বিশারদের কাছে গেছেন। খুলে বললেন তাঁর কাছে গতরাতে ঘটনা। স্বপ্ন বিশারদ বর্ণনা শুনে খীর স্থিরভাবে

বললেন, 'শেখ সাহেব। অদূর ভবিষ্যতে আপনি এক ভাগ্যবান সন্তানের পিতা হতে যাচ্ছেন।'

শেখ নূর মুহাম্মদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। ঘরে ফিরে তাঁর জী ইমাম বিবিকেও এ সুসংবাদ জানালেন। তিনিও এটা শুনে আনন্দিত হলেন।

দিন যায় আর আসে। পিতামাতা গভীর আগ্রহে চেয়ে আছেন সেই সোনালী দিনের প্রতি—যেদিন তাঁরা লাভ করবেন একটি নয়নমণি সোনার চাঁদ। রাতের মুসাফির যেমনি সুবেহে সাদিকের আশায় থাকে অপেক্ষমান তিক তেমনি তাঁরাও প্রতীক্ষায় রইলেন কখন আসবে সেই শিশু মেহমান—আল্লাহর অপার দান। ইতিমধ্যে তাঁরা তিক করে ফেলছেন নবজাতকের নাম। তার নাম হবে 'ইকবাল' মানে—সৌভাগ্য।'

স্মরণীয় দিন

১২৮৯ হিজরীর ২৪শে বিলহজ্জ মুতাবিক ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ ইংরেজী (মতান্তরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) রোজ শুক্রবার একটি স্মরণীয় দিন। দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষিত শিশু আগমন করলো ধরার বুকে।^১ মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীর মাঝে মহাপ্রসূতির সাড়া পড়লো। সবার মুখে একই দোয়া—'আল্লাহ এ ছেলেকে দীর্ঘজীবী করুন।'

নয়নের দুলাল ইকবাল মা বাপের আশার আলো—সোনার ধন। তাঁরা শুধু চান, বড় হয়ে এ ছেলে ইসলামের সেবার সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করুক। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করুক। ফুটফুটে চাঁদের মতো সুন্দর চেহারার ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁদের আন্তরিক দোয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই।

১. ইকবালের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পাজাব ইউনি-ভার্সিটির প্রফেসর তাহের ফারুকী 'সীরাতে ইকবাল', বহু ভাষাবিদ-পণ্ডিত ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'মহাকবি ইকবাল', অধুনালুপ্ত ইকবাল সোসাইটি, ঢাকা-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান সম্পাদিত 'ইকবাল : দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে ইকবালের জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ সালকে কবির জন্ম দিবস স্বীকার করেছেন। ৯ই নভেম্বর পাকিস্তানে সরকারী ছুটির দিন। এদিনটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে 'ইকবাল ডে' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

ইকবাল একদিন সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ করবে কড়ায় গলদে। দেশ ও জাতির সুনাম বয়ে আনবে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম। সমগ্র বিশ্বের জানী-ওনীরা প্রজ্ঞাভরে সমরণ করবে তাঁকে—এটা ছিল আজ্ঞাহার ইচ্ছে।

বংশ-পরিচয় ও পেশা

শেখ নুর মুহাম্মদ প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরীতে ছিলেন। মোটা অংকের মাইনে পেতেন তিনি। তাঁর সংসার জীবন ছিল অত্যন্ত সুখী। স্বপ্নের ব্যাখ্যার শুভ সংবাদ শুনে তাঁর মন-মানসিকতা হঠাৎ পাল্টে গেল—না, সরকারী চাকুরীতে হালাল রুজীর সন্দেহ আছে। আর সন্দেহযুক্ত রুজী-রোযগারে জীবন-যাপন করলে ভবিষ্যত বংশধররা ও এর থেকে মুক্ত হতে পারে না। পরাধীন হিসেবে চোখ বুঁজে সরকারের গোলামী করে যাবে, স্বাধীনভাবে কোন কিছু করতে পারবেই না। উপরন্তু হারাম মিশ্রিত রোজগারে পেট পূরবে। অবশেষে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ধরলেন বাবসা বাগিজ্যের পথ।

মা ইমাম বিবি ছিলেন উচ্চবংশীয়া শিক্ষিতা মহিলা। সাংসারিক জীবনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, বুদ্ধিমতী ও স্নেহবতী। তিনি ছিলেন ইকবালের দিগদর্শন। ইকবাল তাঁর মায়ের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

তোমারই চেণ্টায় আমি
আকাশের তারকা পেয়েছি।
আমার জীবনেতিহাসে
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে,
তোমার স্নেহমাখা নাম
থাকবে চির অশ্লান।

চতুর্থ অধ্যায় বাল্য জীবন

পরম আদর-যত্নে লালিত-পালিত হতে লাগলো শিশু ইকবাল। ঘীরে ঘীরে বেড়ে উঠছে। শান্ত-শিষ্ট ও কোমল স্বভাব ছেলেটির। মা-বাপ শিক্ষা দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে—স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে। মাস গেরিয়ে বছর। এভাবে বয়স যখন পাঁচ বছর হলো, আশ্বা-আশ্মা আদর যত্ন করে মজ্জবে পাঠাতে শুরু করলেন। উৎসাহ দিতে লাগলেন ছেলেকে পড়ার দিকে। মজ্জবে ইকবালের লেখাপড়া, কথাবার্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ী স্বভাব উদ্ভাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

একদিন সকাল বেলা। শেখ নূর মুহাম্মদ নিত্য দিনের মতো ফজর নামায সেরে কুরআন তিলাওত করলেন। অতঃপর ইকবালকে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন। ছেলেকে তিনি ঈমান-কলেমা ইত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ইকবালকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা। যদি তুমি বড় হয়ে কুরআনের খেদমত করতে পারো তাহলে দীর্ঘায়ু লাভ কর। আর যদি তা না পারো, তাহলে এখনই মরে যাওয়া ভালো।' পিতার এই আশা কিরাপ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

ইকবালের বুদ্ধি ও মেধা খুব দ্রুত মজ্জবের উদ্ভাদজীর সুনজর লাভ করে। প্রতিদিন তিনি খোঁজ নেন ইকবালের পড়াশুনার। পরম স্নেহ করতেন তিনি। ইকবাল এতে পেতো দারুণ উৎসাহ। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে মধুর সম্পর্ক ছিল সবার সাথে। তাই ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে আদর করতো—ভালোবাসতো। রোজ সকালে মজ্জবে পৌঁছার ক্ষেত্রে ইকবালের সুনাম ছিল—দেরী হতো না মোটেও।

একদিন সকাল বেলা। মজ্জবের ক্লাস যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল। সেদিন মজ্জবে ইকবালের পৌঁছতে পৌঁছতে দেরী হলো। উদ্ভাদজী ক্লাসের ছাত্রদের দিকে নজর করে দেখেন, ইকবাল অনুপস্থিত। উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ভাবছেন কত কিছু। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ইকবাল

এসে হাযির। উস্তাদজী কাছে ডাকলেন ইকবালকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা বাবা! আজকে তোমার এতো দেরী হলো কেন? অসুখ হয়নি তো।

ইকবাল সুন্দরভাবে জবাব দিল। বললো—‘ইকবাল দের হে আতা হায়।’ —ইকবাল (সৌভাগ্য) দেরীতেই আসে। জবাব শুনে উস্তাদজী অবাক হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর জবাব। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ছেলে একদিন জানী-গণীদেরকে অবাক করে দেবে। ইকবালের বয়স তখন আট-দশ বছর মাত্র।

মন্তবে ইকবাল কুরআন শরীফ ছাড়া ও উর্দু ও ইংরেজী পড়তো। তখন-কার যুগে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মন্তবেই পড়ানো হতো। ইকবাল সবগুলো ক্লাসে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করে এবং ১৮৮৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। শেখ নূর মুহাম্মদের বাল্য বন্ধু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা মীর হাসানও ইকবালের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। শেখ সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কারণ তিনি প্রথম দিকে ইতস্তত কর-ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা দেবেন কিনা। মাওলানা সাহেব বললেন, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেয়া হলে ইংরেজী কেন অন্যান্য ভাষায় ও শিক্ষা দিলে ইসলামের শিক্ষা প্রসারের জন্য বেশ সুফল দেবে। এতে আশঙ্ক হয়ে ১৮৮৮ সালে একচ্চ মিশন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন।

ডিক্কুর প্রতি আচরণ

একদিন ইকবাল পড়ার ঘরে বসে অধ্যয়ন করছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া হচ্ছে। বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এমন সময় একজন ডিক্কুর একেবারে বাড়ীর ভেতরের গেইটে প্রবেশ করলো। মাগো! এ গরীবকে যা পারেন সাহায্য করেন। মাগো... ক্ষিধের জ্বালায় আর বাঁচি না। এভাবে ডিক্কারীটি ইকবালকে বিরক্ত করে তুললো। কানের উপর হাঁক-ডাক আর কতো সহ্য করা যায়। একবার-দু'বার মাফ করার জন্য বললেন। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা; কথায় মোটেও কান দেয় না। শুধু বলেই যাচ্ছে—মাগো...। ইকবাল এবার চটে গেলেন। আস্তে করে এক টুকরা ইট হাতে নিয়ে সজোরে ডিক্কুর দিকে মারলেন। এতে ডিক্কুর আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ডিক্কার খেলেটি মাটিতে পড়ে লগ্ন-লগ্ন হয়ে গেল। ডিক্কুরের হাঁট-মুঁউ চীৎকার শুনে

অন্দর মহল থেকে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ ছুটে এলেন। এসে দেখেন ডিক্কু-কের গোচনীয় অবস্থা। তিনি তাকে তুলে এনে ঘরে বসালেন। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ইকবালকে বললেন, কিয়ামতের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতগণ সমবেত হবেন, সেখানে গায়ী, শহীদ, জানী-সাধক, আবেদ, হাক্কেজ সবাই উপস্থিত থাকবেন। আর তখন এঁদের সামনে রসূল (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করবেন—আমি একজন মুসলিম সন্তান তোমাকে দান করেছি, তাকে তুমি মানুষ করতে পারলে না! তখন আমি কী জবাব দেবো? ডিক্কুকের সাথে তোমার এ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত ও লজ্জিত। এ সময় শেখ নূর মুহাম্মদের দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইকবাল লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। অপরাধের জন্য গভীর-ভাবে অনুতপ্ত হলেন। অবশেষে শেখ নূর মুহাম্মদ ডিক্কুককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। সেদিন থেকে ইকবাল আর দ্বিতীয়বার এ ধরনের কোন অপরাধ করেনি।

পড়াশুনার জন্য উপদেশ

শেখ নূর মুহাম্মদ প্রায় সমস্তই লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে পড়ার ঘরের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ছেলের পড়াশুনার খোঁজখবর রাখতেন। একদিন সকাল বেলা কুরআন অধ্যয়নকালে তিনি ছেলেকে বললেন, 'বাবা! তুমি এভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে যাতে তোমার এটা মনে হয় যে, যেন তোমার উপর কুরআন নাখিল হচ্ছে।' লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পিতা ইকবালের হাত ধরে ওয়াদা করালেন, 'বড় হয়ে তুমি কুরআনের উপর গবেষণা করবে এবং এর শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে।' বস্তুত পক্ষে ইকবাল তাঁর এ ওয়াদা আজীবন যথাযথ-ভাবে পালন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষাজীবন

১৮৯১ সাল। ইকবাল সিয়াল কোটের এস্কট মিশন হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'মেডেল' লাভ করেন। পুরস্কার লাভের সূচনা এখান থেকেই। আক্বা-আশ্রা, আখীর-স্বজনের খুশীতে আর তাঁই নেই। তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হলো ইকবালের কৃতিত্বে। সবাই-তাঁর ভবিষ্যত উন্নতির জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

১৮৯৩ সালে ইকবাল মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক ও ফেলোশীপ লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে ভর্তি হন সিয়াল-কোটের এস্কট মিশন কলেজে। মাওলানা মীর হাসান এ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৬ সালে ইকবাল কৃতিত্বের সাথে এফ. আই. (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আক্বা শেখ নূর মুহাম্মদ মাওলানা মীর হাসানের সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে বি. এ. পড়ার জন্য লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এ কলেজের বেশ সুনাম রয়েছে। লেখা-পড়ার পরিবেশ ছিল বেশ উন্নত। প্রতি বছর বহুসংখ্যক ছাত্র এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।

ইকবাল লাহোর গিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত ও খুশী দু'টোই হলেন। দৃষ্টিভ্রান্ত এজন্য যে, আখীর-স্বজন ও মাওলানা মীর হাসানের বিচ্ছেদ এবং খুশী এজন্য যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে যে সব খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের নাম শুনে আসছিলেন, লাহোরে এসে তাঁদের সাক্ষাত পেলে। আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালী, মীর্যা আরশাদ গোরগানী প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইকবাল যে সব কবি-সাহিত্যিকদের পরম সান্নিধ্য লাভ করতেন, তখন কি কেউ জানতেন যে, এই তরুণই একদিন বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে।

মাওলানা মীর হাসান : অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান ছিলেন লাহোরের একজন অনামধন্য ও বরেন্য আলিম। আরবী ও ফার্সী ভাষায় ছিল তাঁর গভীর পারদর্শিতা। সিয়ানকোটের ছোট বড় সবার কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। লাহোর এস্‌কচ মিশন কলেজে তিনি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। সে যুগে আলিম সমাজে তাঁর মতো সর্ববিষয়ে পারদর্শী বিদ্বান ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল। তিনি ছিলেন আলিম সমাজের শিরোমণি, বিদ্যার সাগর।

শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো। কেননা প্রথমদিকে তিনি যেভাবে বড়াবড়া শাসন করতেন তাতে অনেকেই হিমসিম খেয়ে যেত, কথার কথায় শাসাতেন খুব। এটা ছিল তাঁর শিক্ষা-দানের টেকনিক। যে ছাত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় ধৈর্য সহকারে এসব সহ্য করতো, পরবর্তীতে তিনি তার জন্য জানের দুয়ার খুলে দিতেন। অন্তরঙ্গভাবে মাস্তানা-মমতার ছায়াতলে আশ্রয় দিতেন। ফলে প্রকৃত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্ররা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হতো। ইকবাল ছিলেন এদেরই একজন। এ মহান মাওলানার কাছে অমূল্য শিক্ষা লাভ করে ইকবাল ধন্য হলেন।

ইকবালের পিতা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে দেখা করতেন। আলোচনা করতেন। একদিন মাওলানা বললেন, আপনার হেলেকে মস্তবের শিক্ষা দ্বারা তৃপ্ত করা যাবে না। 'বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াতে হবে ওকে।' ইকবাল তাঁর কাছে এফ. আই. পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। আরবী, ফার্সী, ইসলামিয়াত ও হিকমত প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন।

ইকবাল মাওলানার পবিত্র সাহচর্যে গিয়ে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সুফী দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। এতে তাঁর জীবনে সোনার সোহাগায় মিলন হয়েছে। 'পারস্য ভাষায় কুরআন' নামে খ্যাত মগনভী শরীফের ভাষ্যকার ছিলেন মাওলানা মীর হাসান। ইকবালকে নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগনভীর আলোচনা করতেন। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা ইকবালকে রুমী (রঃ)-এর দার্শনিক ভাবধারায় উজ্জীবিত একজন মরমী কবি হিসেবে দেখি। বস্তুতঃ সুফী মতবাদের প্রতি আকর্ষণ ইকবালের ছোট বেলা থেকেই অন্তরে সুপ্ত ছিল। মীর হাসানের সাহচর্যে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে আল্লামা রুমীর কাব্যিক ভাব-দর্শনের চাপ পরিমলিত হয়।

ইকবাল বলেছেন :

মরা বিগর কি দর হিন্দুস্তাঁ নমী বীনা
ব্রাহ্মন রময্ আশনায়ে রুম ও তাবরীয আন্ত

‘আমার প্রতি লজ্জা কর। কেননা আমাকে ভারত দেখবে না।
এক রাজপুত্র সন্তান মাওলানা রুমী ও শামসউদ্দীন তাবরীযীর (কাব্যের)
রহস্যবিদ হয়েছি।’

‘ইলতিজা-ই-মুসাফির’ কবিতায় ইকবাল সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ
মীর হাসানের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : তিনি আমার কাছে আলী
মুর্তযা (রাঃ)-এর জ্ঞানের দ্বারের মত। তিনি চিরদিন আমার কাছে
পবিত্র কা’বার ন্যায় সন্মানিত থাকবেন। তিনি আমার কল্যাণ কামনা
করেছেন। তাঁর মহত্ত্ব আমাকে জানী করেছে।

ইকবালের ভাষায় :

‘উওহ্ শমা’ এ বারগাহে খান্দানে মূর্তযাভী
রহেগা মিস্লে হেরম জিস্কা আন্তাঁ মূজকো।
নফস্ সে জিস্কে খোদী মেরী আরযু কী কলী,
বনায়া জিস্কা মরওতনে নুকতাদাঁ মূজকো।
দোয়া ইয়েহ্ কর কি খোদাওন্দে আসমানো যমী’
করে ফের উস্কা খিয়ারত সে শাদ মী মূজকো।’

‘প্রদীপ্ত আলোর শিখা

খান্দানে আলী মূর্তযার,

কা’বার সন্মান হেন

তাঁর ঘর কাছেতে আমার।

আমার হৃদয়-কলি

প্রস্ফুটিত যাহার নিঃশ্বাসে,

যাঁর দানে তত্ত্ববিদ

আমার এ জীবনে বিকাশে।

আসমান-যমীনের

প্রভু ওগো মালিক সবার,

সুখী করো, এই দোয়া

আরবার দর্শনে তাঁহার।’

১৮৯৬ সালে লাহোরের এক জনাকীর্ণ সাহিত্য সভায় ইকবাল জীবনের সর্বপ্রথম মুশায়েরা বা কবিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতার রচনা-শৈলী শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দেয়। এতে অল্পদিনের মধ্যে ইকবালের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৭ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ইকবাল আরবী ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা নিয়ে প্রথম বিভাগে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এ বছরই তিনি জামাল উদ্দিন পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারের খবর সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। এতে তিনি দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

টমাস আরনল্ড : ইকবালের অনন্য শিক্ষক

দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ইকবালের গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৯৮ সালে তিনি উক্ত কলেজের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। এখানেও তিনি আর একজন খ্যাতনামা শিক্ষকের সঙ্গান পেলেন, যিনি দর্শন শাস্ত্র ছাড়াও ইসলাম ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত ছিল। তিনি হলেন প্রফেসর টমাস আরনল্ড (পরে স্যার)। তিনি একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ ছিলেন। বৃটিশ সরকারের সরাসরি নিয়োগ-পত্র নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন।

টমাস আরনল্ডের সাহচর্য এসে ইকবাল মাওলানা মীর হাসানের অস্তাব মোচন করলেন। তাঁর সান্নিধ্যে ইকবালের জ্ঞানের রাজ্য দ্রুত প্রসারিত হতে লাগলো। টমাস ইকবালকে পেয়ে অশেষ খুশী হলেন। উভয়ের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা হতো। এসব উচ্চাংগের আলোচনা ইকবালের জন্য ছিল অমৃতের ন্যায়। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর টমাসকে ইকবালের অনন্য শিক্ষদাতা বলা চলে। তিনি বলতেন, 'এ ছাত্রই শিক্ষককে (আমাকে) অধিকতর জানী করে তুলেছে।'

ইকবাল প্রায় দু'বছর তাঁর স্নেহছায়ায় শিক্ষা লাভ করে ১৮৯৯ সালে প্রথম বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন এবং কৃতিত্বের স্মৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অধ্যাপনা

এ বছরই তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী বিভাগে সাময়িকভাবে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। মাত্র তিন বছর সেখানে অধ্যা-

পনা করার পর লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর টমাস আরনল্ড লন্ডন চলে যান। সেখানে তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ইকবাল তাঁর বিদায় উপলক্ষে ‘নালায়ে ফিরাক’—‘বিচ্ছেদের আর্তনাদ’ কবিতাটি প্রজ্ঞাঞ্জলী হিসেবে পেশ করেন। কবিতাটি মাসিক মাখখানে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইকবাল ছাত্রদেরকে যে কোন বিষয়ে অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করার পর আরবী বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ছাত্ররা তাঁর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনায় পরম তৃপ্ত হতো। তাঁর প্রখর জ্ঞান ও গবেষণা যে কোন বিষয় সহজবোধ্য করে দিত। ফলে কিছুকালের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের পরম আস্থাভাজন শিক্ষক হয়ে যান।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায়

ইকবাল তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘নালায়ে ইয়াতীম’—‘ইয়াতীমের আর্তনাদ’ কবিতাটি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায় সর্বপ্রথম আবৃত্তি করেন। এ কবিতাটি শ্রোতাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। শ্রোতারা ইকবালের আবৃত্তির সাথে সাথে মুহম্মদ তাকবীর ধ্বনিত আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। কবিতাটির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের অর্থানুকূল্যে দুই লক্ষ কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় ইকবাল মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার বিষদ বর্ণনা দিয়ে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা ‘হিমালাহ্’ ও ‘হিন্দুস্তা হামারা’ প্রভৃতি আঞ্জুমানের সভায় আবৃত্তি হয়েছিল। সর্বসাধারণের কাছে তাঁর এ কবিতাগুলোও বিপুল সমাদর লাভ করে। কবির হৃদয় নিঃড়ানো আকৃতি সবার প্রাণে স্পন্দন জাগায়।

এক সভায় আল্লামা আলতাফ হোসাইন আলী, ডঃ নজীর আহমদ, মীর্যা রাশেদ গারগানী, মিয়া মুহাম্মদ শফী, স্যার আবদুল কাদের, স্যার ফজলে হোসাইন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, খাজা হাসান নিজামী প্রমুখ মনীষী উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে আল্লামা হালী তাঁকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। তখন হাযার-হাযার লোকের মুহম্মদ তাকবীর ধ্বনিত সভাঙ্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

কিছুদিন পরের কথা। এক সভায় আল্লামা হালীর কবিতা আবৃত্তির কথা ছিল। লাহোরের সর্বত্র প্রচারিত হলো এ খবর। খবর পেয়ে হাযার-হাযার ভক্ত-অনুরক্ত ছুটে এল। বার্ষিকের কারণে আল্লামা হালীর তখন পূর্বের সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর নেই। আওয়াজ এতই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল যে, পাশে বসেও তাঁর বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হতো। তবুও ভক্তদের একান্ত অনুরোধে তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে হলো। এটা যেন তাঁর অস্তিম আবৃত্তি। কিছুক্ষণ আবৃত্তি করার পর তিনি অপারগ হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর স্যার আবদুল কাদের সাহেব মাইকে ঘোষনা করলেন—তাঁর অবশিষ্ট কবিতাটুকু তরুণ কবি ইকবাল আবৃত্তি করে শুনাবেন। তখন প্রোতারা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সভাস্থল মুখরিত করে তোলে।

এবার ইকবাল হালীর কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে চার লাইনের একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। এটা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। তা ছিল এই:

شہور زوالہ میں ہے نام حالی - معمورے حق سے جام حالی
میں کشور شعر کا نبی ہوں گوہا - نازل ہے رہے لب سے کلام حالی

‘আল্লামা হালী এ যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর পাত্র (কবিতা) সত্যে সমৃদ্ধ। আমি একজন কিশোর, নবীর মতো (নবীরা যেমনি আল্লাহর ওহী নিয়ে কথা বলেন তেমনি) আমার কণ্ঠ থেকে কবি হালীর কথাই বেরচ্ছে।’

‘মলফুজাতে ইকবাল’ গ্রন্থে আল্লামা শেখ আবদুল কাদের লিখেছেন, ‘আগুমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ইকবাল মর্মস্পর্শী সুরে ‘শেকওয়া’ পাঠ করলেন। উপস্থিত হাযার-হাযার লোককে তিনি আবেগময়ী কবিতা দ্বারা মুগ্ধ করে ফেললেন। তখন চারদিক থেকে লোকেরা অজ্ঞপ্ত ফুল বর্ষণ করতে লাগলো।

ইকবালের বয়সান পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ এ কবিতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছেলের এ কৃতিত্ব দেখে তাঁর দু’নয়নে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। খুশিতে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন।

বিখ্যাত হেফিম হাসান কারশী লিখেছেন : এক মজলিসের ঘটনা । ইকবাল তাঁর আবেগ জড়িত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করলেন । কবিতার নাম ছিল ‘দরবারে রিসালত মৌ’—‘নবীর দরবারে আরম্ভ’ । ‘দেখা গেল, শ্রোতা-সাধারণ তুমুল তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে আনন্দে মুগ্ধরিত হয়ে উঠলো । লাহোর শাহী জামে মসজিদে বিশাল প্রাঙ্গন জনসমূহের এ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠলো ।

পরবর্তীতে লাহোরের যে কোন ইসলামী জলসায় ইকবাল ছিলেন প্রধান আকর্ষণ—মধ্যমণি । দলে দলে ভক্তরা তাঁর কবিতা শোনার জন্য ছুটে আসতেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ইউরোপে

পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী

কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর জ্ঞান-সাধক ইকবালের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন—যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে হবে। ১৯০৫ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের চাকুরী ইস্তফা দিয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানী গেলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে তাঁর ভাই ইঞ্জিনিয়ার আতা মুহাম্মদ সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি দিল্লীর নিজাম উদ্দীন আলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন। জার্মানীতে পৌঁছে তিনি মিউনিক ইউনিভার্সিটির অধীনে উচ্চতর দর্শন শাস্ত্রের গবেষণায় নিয়োজিত হন।

মজার ব্যাপার! দীর্ঘদিন পর পরম শ্রদ্ধের শিক্ষক স্যার টমাস আর-নল্ডের সাক্ষাৎ পেলেন। ইকবাল তাঁর পরামর্শক্রমে ‘পারস্যীয় মরমীবাদ’ নামে একটি অনন্য গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৭ সালে জার্মানীর মিউনিক ইউনিভার্সিটি তাঁর Development of Metaphysics in Persia থিসিসের জন্য P. H. D. ডিগ্রী প্রদান করে। এটা তাঁর জন্য বিরাট ভাগ্য ও মুসলিম বিশ্বের জন্য গৌরবের ব্যাপার ছিল। তাঁর উক্ত থিসিসটি লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশনী ১৯০৮ সালে প্রকাশ করে। এছাড়াও পরবর্তীতে উক্ত থিসিসটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষায়ও এটি অনূদিত হয়েছে।

আইন শাস্ত্র ডিগ্রী

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর ইকবালের মনে আরেকটি নতুন সাধ জাগলো। বলতে গেলে এটাই ছিল তাঁর অধ্যয়নের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এবারও স্যার টমাস আরনল্ডের পরামর্শক্রমে লন্ডনের লিঙ্কনস্ ইন-এ এসে আইন শাস্ত্রের উচ্চতর অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি হলেন। দেখা গেল জীবনের সর্বশেষ পরী-

ফায়ও তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উদ্ভীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালে 'বার-এট-ল' (লণ্ডন) ডিগ্রী লাভ করেন।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা

১৯০৭ সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের পর জানতে পারলেন—লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, ইকবালের অন্যতম শিক্ষক স্যার টমাস আরনল্ড বিশেষ প্রয়োজনে এক বছরের ছুটিতে যান্ধেন। তিনি ইকবালকে তাঁর অনুপস্থিতি কালীন সময়ে তাঁর স্থলে অধ্যাপনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্যার টমাস ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে যোগ্য ছাত্র ইকবালকে তাঁর স্বলাভিষিক্ত করে গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা অনুসারে ইকবাল ১৯০৭—১৯০৮ সাল পর্যন্ত এক বছরের জন্য উক্ত ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে বার-এট-ল ডিগ্রী লাভ করার পর ব্যারিস্টারী করার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ফিরে আসেন। লণ্ডন থেকে ফেরার পথে আলীগড়ে এসে সংস্কৃত ভাষা শেখেন।

স্বদেশ ফেরার পর তিনি আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ সালে লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। তাহাড়াও লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

জার্মানী ও লণ্ডনে

উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মানী ও লণ্ডনে অবস্থান কালে ইকবাল সেখানকার লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও গবেষক মহলে সুপরিচিতি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সবার আপনজন হয়ে উঠেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমায় সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সবার সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ইকবালের প্রবাস জীবন অত্যন্ত সুখে কাটে। তাই দূর বিদেশের নিঃসঙ্গতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

জার্মানী পৌঁছে ইকবাল ক্যান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'মুসলিম তমুদ্দুনের মর্মকথা' প্রভৃতি বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো এতো জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বমূলক ছিল যে, শত-শত ইংরেজ বুদ্ধি-জীবীর মনে তা গভীর রেখাপাত করে। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রথমত ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করেন এবং তাওহীদ, রিসালত ও ইবাদতের গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

এসব বক্তৃতায় তিনি বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতিকে একটি সত্যের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তৃতার সারাংশগুলো জার্মানীর জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক-গুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হয়।

ডঃ আর. এ. নিকলসন

লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি বিপুলভাবে সমাদৃত হন। অনেক জানী-গুণী ও শিক্ষাবিদেব সাথে তাঁর আশাতীত বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ বিখ্যাত মনীষী ডঃ আর. এ. নিকলসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইকবালের গুণ মাধুর্যে অভিভূত ভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। লন্ডন থেকে স্বদেশ ফেরার সময় নিকলসন ইকবালকে পুনরায় লন্ডন আসার জন্য উদ্যাদা করান। পরবর্তীকালে ইকবাল লন্ডনে 'গোল টেবিল' বৈঠকে যোগদান করতে গেলে ডঃ নিকলসনের সাথে পুনর্বার সৌজন্য-সাক্ষাত করেন।

ডঃ নিকলসন 'আসরারে খুদী' বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইকবালের প্রতি সম্মান জানান এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের চির যোগসূত্র স্থাপন করেন। এ দু'জন মনীষী আজীবন একে অপরকে সম্মরণ রেখেছিলেন। ডঃ নিকলসনের ইংরেজী অনুবাদটি ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি পাঠকমহলে আশাতীত সমাদর লাভ করে এবং ইকবালের কাব্যপ্রতিভা পাশ্চাত্যের জানী-গুণীদের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায় কাব্য-চর্চা ও স্বীকৃতি

১৮৯৬ সালে ছাত্রাবস্থায় দিয়ারাকোটের কবিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পর থেকে ইকবালের মন-মানসিকতা কাব্য-চর্চার দিকে খুবীক পড়ে এবং তা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। তিনি রীতিমত কাব্য-চর্চা করতে লাগলেন।

একদিন ছাত্রসভাবাদের উপর কবি দানের কাছে কতগুলো কবিতা ও মূল্য সংশোধনের জন্য পাঠালেন। কবি দান এগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন। তারপর ছোট একটি মন্তব্য লিখে পাঠালেন—‘এ কবিতাগুলো সংশোধন করার কোন অবকাশ রাখে না—এগুলো কবির স্বপ্ন মনের সার্থক, সুন্দর ও অনবদ্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিয়ে।’ এ মন্তব্য দেখে ইকবাল খুশিতে আউখানা। স্বনামধন্য কবির মন্তব্যে তাঁর উৎসাহ আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি আরো গভীরভাবে কাব্য-চর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

তাঁর কবিতায় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ছিল। অদেশ প্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ, ইসলামের শায়ত আদর্শে তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্নি, জাতির উত্থান-পতন, দলীয় কলহ ও অভ্যর্থনা নিরসন প্রভৃতি বিষয় কবিতায় স্থান পেতো। মুমত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী সুরে আহবান জানাতেন ক্লাভিহীন ভাবে। স্বকীয় আদর্শের সজ্জানে ছুব সমাজকে উত্তুঙ্গ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

ইকবালের কবো চিরন্তন আবেদন ও আবেগ রয়েছে বলেই অত্যন্ত সময়ে তিনি বিধে খ্যাতি লাভ করেছেন। জাতি-ধর্ম নিবিশেষে তিনি সবাই যে সম্মান পেয়েছেন—তা ইতিহাসে বিরল। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের একজন হিন্দু অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—‘মুসল-মানসপ ইকবালকে লক্ষ বার তাদের সম্পদ বলে দাবী করতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণী-বিশেষের সম্পদ নন—তিনি একান্তভাবে আমাদেরও।’

১৯০১ সাল। এপ্রিলের এক শুভ সকাল। তৎকালীন 'সর্বপ্রতি উদু' পত্রিকা 'মাখঘান'-এর বিশেষস্থানে তাঁর 'হিমালাহ' কবিতা প্রকাশিত হয়। ইকবাল তা দেখে অশেষ খুশী হন। এতে তাঁর উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।

আল্লামা শিবলী নূ'মানী, আলতাফ হুসাইন হানী, আকবর এলাহাবাদী প্রমুখ খ্যাতিমান কবির পথ অনুসরণ করেই ইকবাল অসংখ্য কবিতা ও গল্প রচনা করেন। সহজ ভাবে বলতে গেলে—তাঁদের মতবাদের অপূর্ণতাকে ইকবাল পরিপূর্ণতা দান করেন।

মুসলমানদের স্তম্ভ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ও ইকবাল বেশ কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ব্রিটিশের প্রবর্তিত ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের তাওহীদ, ইমান, আকীদা ও ইসলামী চরিত্রের বহু-খেলাফ। তাই তিনি এ ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি এতেও সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর রচিত পুস্তক 'আল-ইলমুল ইকতেসাদ' উদু ভাষায় অর্থনীতির উপর প্রথম পুস্তক। এটি ১৯০৩ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

তাঁর পড়ার ঘরে রাশি-রাশি বই পুস্তক এখানে সেখানে হড়ানো-ছিটানো থাকতো। চাকর এগুলো গুছিয়ে রাখতে চাইলে তিনি বাধা দিতেন এবং বলতেন—বইগুলো এলোমেলো থাকলেই এক সময়ে অনেকগুলো বই দেখতে পাই। আর গুছিয়ে রাখলে বই চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তখন আমার মন অস্থির হয়ে ওঠবে।

একদিনের ঘটনা। গভীর রাতে ইকবাল কবিতা লিখছেন। সাহেবের ভূমিকম্প চলছে। চারদিকে ধ্বংসের তাওবলীলা। ঘর বাড়ী ভেঙে চুর-মার হয়ে যেতে লাগলো। ইকবালের সেদিকে মোটেও লক্ষ্য নেই। তিনি শুধু লিখেই যাচ্ছেন। বাইরে কি ঘটছে, সে সম্পর্কে কে-ধবর। চাকর আলী বখশ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। আর চীৎকার করছে, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!! ইকবাল এতক্ষণে টের গেলেন। আলীকে বললেন—ছুটোছুটি করো না। বরং সিঁড়ির উপর নীরবে দাঁড়িয়ে থাক।' এতটুকুই বলে তিনি আবার লেখার কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আল্লাহর রহমত। সেদিনের ভূমিকম্পে চারদিকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলোও তাঁর আশে-পাশে কোন ক্ষতি হয়নি।

আল্লামা ইকবাল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর অমর কাব্য আমাদেরকে ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক নেতার চাইতে ইসলামী ভাবধারায় কালজয়ী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কবি হিসেবে বেশী পরিচিত করে। মুসলিম উম্মাহর একজন যুগের নকীব ও সফল সংস্কারক ইকবালের কাব্যের চিরন্তন ও শাস্ত্র আহ্বান চিন্তাশীল মানুষের চিত্ত স্পর্শ করবেই।

তাঁর সুদীর্ঘ কালের কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. ছাত্র-জীবন থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জাতির উত্থান পতনের কারণ নির্ণয় ও জাতিভেদের অবসান কামনা।

দুই. ১৯০৫-১৯০৮ সাল পর্যন্ত দেশাত্মবোধ, ধর্ম ও মুসলিম বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

তিন. ১৯০৮-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইসলামের দর্শন ও শাস্ত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার আহ্বান।

কর্মজীবনে সততার দৃষ্টান্ত

১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর থেকে তিনি লাহোরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। কয়েক বছর পর থেকে লাহোরে সুপ্রিম কোর্ট আইন ব্যবসা শুরু করেন। তাছাড়া লাহোরে গভর্নমেন্ট কলেজে (নৈশ বিভাগ) অধ্যাপনাও করেছেন।

কর্মজীবনে পদার্পণ করার পর ইকবাল কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। এ সময় সাধারণত জ্ঞান সাধনা, গভীর রাতে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করে কাটাতেন।

সরলভাবে জীবন যাপন ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার গ্রহণ করে কোর্টে চলে যেতেন আর রাতে শুধু এক পেয়লা লবণ-চা পান করে কলেজে যেতেন।

আইন ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায্যনিষ্ঠ। অন্যায়-অসত্য মামলা তো তিনি গ্রহণ করতেনই না, উপরন্তু মজলুমের পক্ষে তাঁর সর্ব-শক্তি নিয়োগ করতেন। আইনের মারপ্যাঁচে জালিমকে কখনও সাহায্য-সহযোগিতার প্রশ্ন দিতেন না। কারণ তিনি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন—মানুষের বিন্দু মাত্র অন্যায়ের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে

জবাবদিহি করতে হবে। জীবনে কোন প্রলোভনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। পরিমিত ব্যয়ে চলার উপযোগী টাকা পেলে তিনি নতুন মামলাই গ্রহণ করতেন না।

১৯২৬ সালে বিখ্যাত ডুমরাও রাজ্য মাগলার বাংলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দু'মাসের জন্য পাটনায় আসেন। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের সামনে অর্থ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্যাখ্যা দান করা। তাঁর দৈনিক সন্মানী ছিল এক হাযার টাকা—দু'মাসে ষাট হাযার টাকা। ডঃ ইকবাল এসেই মামলার সমুদয় কাগজপত্র দেখলেন। মাত্র দু'দিনের খসড়ায় তাঁর মতামত পেশ করে আদালতে দাখিল করলেন এবং লাহোর চলে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিনের খুলন্ত মামলা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইকবাল ইচ্ছে করে অযথা বিলম্ব না করে তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সংক্ৰিপ্ত সময়ে শেষ করে দিলেন। গড়িমসি করে বিলম্ব করলে তাঁরই লাভ হতো। কারণ দৈনিক হাযার টাকা সন্মানী সে সময়ে ছিল বিরাট ব্যাপার। টাকার প্রতি যে তাঁর লোভ ছিল না, এটা তার প্রমাণ। অসহায় গরীব লোকের মামলা তিনি বিনা পরসায় করে দিতেন।

ডক্টর অব লিটারেচর, ডি, লিট, স্যার উপাধি ও সম্বর্ধনা সভা

কবি ইকবালের কাব্যের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একজন কৃতি সন্তানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সন্মান দেয়া হয়নি দেখে পাঞ্জাবের সাবেক শাসনকর্তা স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান বিস্মিত হন। তিনি এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালে ইকবালকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। দীর্ঘ দিন পর তিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেন। তাঁর এ সৌভাগ্যের সংবাদ শুনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই খুশী হলেন।

অন্যদিকে ইকবাল স্যার উপাধি গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—‘আমাকে স্যার উপাধি দিতে গেলে পূর্বাংগে আমার উস্তাদ মাওলানা মীর হাসানকে ‘শামসুল উলামা’ (আলেম গণের সূর্য) উপাধি দিতে হবে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁর দাবী ‘নীতিগতভাবে মেনে নিলেন’ এবং যথারীতি মাওলানাকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধিতে ভূষিত করার পর ইকবাল তাঁর ‘স্যার’ উপাধি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও গুণের কদর সবার কাছে সমান। জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মিসর, তুরস্ক, ইরান, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তাঁর উক্তবন্দ লাহোরে ছুটে আসতে লাগলো। তাদের উদ্দেশ্য, শুধু প্রাণপ্রিয় কবিকে অভিনন্দন জানানো এবং তাঁর দর্শন লাভ করা।

মুসলমানদের মতো শিখ ও হিন্দুরাও ইকবালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তাঁর সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ এ তিন জাতির পক্ষ থেকে লাহোরের বাসিন্দারা সাড়ম্বরে তাঁকে সম্বাদিত করে। পাজাব ও লাহোরের হাযার হাযার লোক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তা, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের প্রাণ-প্রিয় কবিকে সম্মান জানানোর জন্য উপস্থিত হন। ইকবাল সেখানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

ব্রিটিশ সরকার থেকে স্যার উপাধি পাওয়ার পর সমালোচকরা ইকবালের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করতে লাগলো। কেউ বলতে লাগলো—ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতিবাদী কন্ঠ স্তব্ধ করার জন্য এটা একটা চক্রান্ত করেছে। অনেকে বলতে লাগলো, ‘অবশেষে ইকবালও কী করবে? পদলোভ ত্যাগ করা এত সহজ নয়।’ আর কেউ বলে বেড়াচ্ছে—‘স্যার উপাধিতে ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটলো।’ ইকবাল এসব অপবাদ নীরবে শুনে শুনে সময়-সুযোগে জওয়াব দেয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁর সম্মানে পাজাবে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তেজোদীপ্ত কন্ঠে এ ভুল ধারণার অপনোদন করলেন তিনি। উক্ত সভায় পাজাবের গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইকবাল কয়েকটি মূল্যবান কবিতা আবৃত্তি করেন, যা ‘তুলুয়ে ইসলাম’ গ্রন্থের শুরুতে সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজের দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন, ‘দুনিয়ার কোন শক্তি শত চেষ্টা করেও আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসার দমিয়ে রাখতে পারবে না।’

১৯৩৩ সালে পাজাব ইউনিভার্সিটি মহাকবি ইকবালকে ‘ডক্টর অব লিটারেচার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৬ সালে আজগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি তাঁর জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিও তাঁকে ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

অষ্টম অধ্যায় রাজনীতির ময়দানে

পাঞ্জাবের আইন সভায়

পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা ছিল তখন অত্যন্ত নাজুক। তাদের সপক্ষে কথা বলার তেমন কেউ ছিল না। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা দুর্দশা কবলিত এ জাতির মুক্তির জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। মুসলমানদের স্বাধিকার আদায় ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে—মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ অন্যতম। তন্মধ্যে ইকবাল ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আন্দোলনের দিক-নির্দেশক।

ইকবালের ইচ্ছে ছিল, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদে সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। ১৯২৪-১৯২৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর একনিষ্ঠভাবে দেশ ও দেশের সেবা করেন। মুসলমানদের উন্নতি ও মুক্তির জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। দেশের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো। বৃটিশের গোলামীর জিজীরে আবদ্ধ মুসলিম জাতির ভাগ্যোন্নয়নই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

আইন পরিষদে সর্বদা চাষী ও মজুরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনে তিনি সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। এতে ক্ষমতাসীনদের ভিত কেঁপে উঠতো। পাঞ্জাব সরকারের আয়কর ও ভূমিকর নীতির বিরুদ্ধে তিনি তৎকালীন রাজস্ব সচিব স্যার ফজলি হোসাইনের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশেষে ইকবালের উপস্থাপিত যুক্তিতে সচিব হেরে গেলেন। ইকবালের দাবী-দাওয়া মাথা পেতে মেনে নিলেন। সে সময়ে আর যাই হোক, যে কোন শাসককে ইকবালের সাথে আলোচনা করতে একটু সমীহ করতে হতো। তাঁর যুক্তির কাছে অন্য কোন যুক্তি হার মানতে বাধ্য হতো। ইকবাল এভাবেই আজীবন মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্ধ্য ইকবালের অন্তরকে আন্দোলিত করে-
তোলে। তিনি স্বীয় প্রজা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ
করে মুসলিম মিচ্চাভের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইকবাল অধঃপতিত দেশ ও যুগান্ত জাতিকে জাগ্রত, উন্নত ও নতুন
কর্মোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করার সংগ্রাম সাধনার জন্য বিজাতীয় সংস্কৃতি
পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এ ছিল বৃটিশ সরকারের
জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৯০০ সালে লাহোর 'আজমায়ে হেমায়েতে ইসলাম'-এর সভায়
'নালায়ে ইয়াতীম'—'ইয়াতীমের আর্তনাদ' শীর্ষক যে কবিতা আবৃত্তি করে-
ছিলেন, সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজকে সে কবিতা দারুণভাবে আলোড়িত
করে তোলে।

১৯১০-১৯১১ সালের ইতিহাস বিশ্বমুসলিমের জন্য কারবালার ইতিহাস।
বলকান ও ত্রিপুরার মুসলমানদের রক্তের বন্যার প্রোত ইকবালের মর্ম-
স্পর্শ করে। সেখানকার ইসলামী খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার
আশংকায় ও শোকে তিনি জ্বালাময়ী কবিতা ও গজল দিয়ে মুসলিম
বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করলেন। মুসলমানরা তাঁর কবিতা গুল
শুনে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ১৯১১ সালে ৬ই অক্টোবর তিনি
লাহোর শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে 'খুনে শহীদা কী নজর' নামে যে কবিতা
আবৃত্তি করেছিলেন তা অপরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কবিতা শ্রোতৃ-
বৃন্দের কান্নায় চোখ ভাসিয়ে দিল।

পরবর্তীতে উক্ত বক্তৃতাবলী সংকলিত হয়ে The Reconstruction
of Religious Thoughts in Islam নামে পুস্তকাকারে ১৯৩১ সালে
লাহোরে প্রকাশিত হয়। বইটি সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন
সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
সম্প্রতি উক্ত বইটির বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডে-
শন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামে প্রকাশিত
হয়।

ইকবালের রাজনৈতিক চেতনার পেছনে কুরআন-হাদীস, ইমাম আল-
গাজ্জালী, আল-রাযী, মাওয়াদী, নিজামুল মুন্ক তুসী, ইবনে হাজম ও ইবনে
খালসূনের চিন্তাধারা দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৮ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর

প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে পর্যায়ক্রমে বহু বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

- ১। জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।
- ২। দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।
- ৩। আল্লাহ সন্মুখে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম।
- ৪। মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা।
- ৫। মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা।
- ৬। ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি।
- ৭। ধর্ম কি সত্য ?

সেখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিপুল সম্মান ও রাজকীয় অন্তর্য্যনা লাভ করেন। দূর দূরান্ত থেকে হাযার-হাযার মানুষের জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় কবিকে এক নজর দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়। এভাবে ইকবালের চিন্তাধারা দিন দিন প্রসারিত হতে লাগলো। জাতীয় জীবনের এ যুগ সজ্জিষ্ণুে এমন একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক কবির আবির্ভাব সত্যিই আল্লাহর অপার রহমত। কবি ইকবালের ছালাময়ী কবিতায় মুসলিম মিল্লাতের মৃত ধমনী সক্রিয় হয়ে ওঠতে লাগলো।

আল-কুরআনের ভাষায় : ‘যে জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহও তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।’ আল্লামা ইকবাল এ আয়াতটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ইসলামের আইন-কানুন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী তমদ্দুন, ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে ব্যয় করেছি। আমার মনে হয়—ইসলামের এসব মূল বিষয়ের সাথে আজীবন সম্পর্কের কারণে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডার যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি।’

ইকবাল ইসলামকে নিছক ধর্মানুষ্ঠান মনে করতেন না। বরং এটাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও মানব জাতির জন্য একমাত্র বিধান বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মানব জীবনের কোন দিকই ইসলামের দৃষ্টির বাইরে নয়। তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। ধর্মকে তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্র তথা সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

শক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা কেবল প্রাচ্য-দেশসমূহে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের চিন্তার রাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এবার ইকবালের সাথে বাস্তবায়িত হওয়ার পদক্ষেপ শুরু হলো। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে পুনর্গঠিত হলো 'অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ।' ভারতবর্ষে ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও ডাবাদর্শে মুসলিম বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন। তাঁদের সুযোগ নেতৃত্বে চলতে লাগলো মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। নেতৃবৃন্দ একাত্ম হয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইকবাল তাঁদেরকে পরামর্শ দিয়ে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করতেন।

মুসলমানদের মনে আশার সঞ্চার হলো। এবার বৃদ্ধি সূত্রে সাদিকের আলোর রেখা ফুটে ওঠবে। হারানো রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার হবে। বৃষ্টিশ বেনিয়াদের হাত থেকে বাঁচা যাবে। সারা ভারতে মুসলিম লীগের তৎপরতা জোরদার হয়ে ওঠলো।

১৯৩০ সালে ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মুসলমানদের জন্য একটা স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করেন। মুসলিম লীগের এখন শুধু একটি মাত্র দাবী, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন মূতাবিক চলতে পারবে এবং দেশ পরিচালনা করতে পারবে। এ বছর এলাহাবাদে 'অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ'র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আল্লামা ইকবালের সভাপতির ডায়গনি ছিল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে ইকবাল সার্বজনিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বসন্ত ইকবাল না থাকলে পাকিস্তান আন্দোলন এত-খানি সফলতা লাভ করতো না। ইকবাল ছিলেন রাজনীতির দার্শনিক আর অন্যরা ছিলেন শুধু রাজনীতিক। তাই বলতে হয়, পাকিস্তান আন্দোলন ইকবালের কাছে একান্তভাবে ঋণী। কিন্তু আল্লাহর মর্শী এ মহামানবী উক্ত আন্দোলন সফল হওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। তাঁর ইন্তেকালে আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলিম লীগের আন্দোলন সফল হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি অভিযোগের জবাব

ইকবালের বিরুদ্ধবাদীরা ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিল। তাঁর ইসলামী আগরণমূলক কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে তারা তুণ ছিলো না। এরা চাইতো ইকবালও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়ান। তারা কটাক্ষ করে বলতো, ইকবাল তো (গোফতারে গায়ী) কথার উদ্ভাদ, (কিরদারে গায়ী নেহী) কাজের উদ্ভাদ নন। এভাবে তারা তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করে যাচ্ছিল।

একদিন মাওলানা মুহাম্মদ আলী এ ব্যাপারে ইকবালকে প্রশ্ন করলে তিনি রসিকতার সুরে জবাব দিলেন :

মায় তু কাওয়াল হো, মায় গাতা হো তোম্ নাচতে হো, কিয়া তোম চাহতে হো। কেহ্ মায় ভী তোমারে সাথ নাচনা শুরু কর দো।

(আসারে ইকবাল : পৃঃ ২৮)

—আমি তো গায়ক, আমি গান গাই আর তোমরা সুরের তালে তালে নাচ। এখন তোমরা কি চাও যে, আমিও তোমাদের সাথে নাচি ?

এর অর্থ হলো, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতা নিয়ে জন্মে। সবার জন্য একই কাজ উপযোগী নয়। ইকবাল সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, তোমরাও তোমাদের দায়িত্ব পালন কর।

নবম অধ্যায় পারিবারিক জীবন

সাদাসিধে জীবন

আজ্জামা ইকবাল অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তাঁর মনে বিদ্যা-বুদ্ধির বিন্দুমাত্রও অহংকার বলতে ছিল না। তাঁর জীবনে ছিল অসংখ্য গুণের সমাহার। এসব গুণরাজি তাঁকে মহীয়ান ও গরীয়ান করে তুলেছে। সারা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর শান-শওকত ও আড়ম্বর থাকতে পারতো, কিন্তু তিনি ছিলেন এর বিপরীত।

তাঁর বন্ধু-বান্ধব, অনুরক্তরা প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি সহাস্য বদনে সবার সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করতেন। সর্বদা তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যেত। দূর-দূরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী ও ভক্তদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে তিনি মোটেও ক্লান্তি বোধ করতেন না। এদের জন্য তাঁর দরবার সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো।

ফুলের সৌরভের মতো ইকবালের চারিত্রিক মাধুর্য মানুষকে মুগ্ধ করে দিত। মুরক্বীকে সন্ধান ও ছোটদেরকে স্নেহ করা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাকে তিনি দারুণভাবে ঘৃণা করতেন। আর সত্যকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

স্যার আবদুল কাদের বলেন, আজ্জামা ইকবাল এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সাথে কেউ সাক্ষাত করলে তিনি বুঝতে পারতেন তাকে কিভাবে বুঝাতে হবে। নিজে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা রাখা ও অপরকে হাস্যোজ্জ্বল রাখাই ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ।

ব্যারিস্টার মীর্খা জালাল উদ্দীন লিখেছেন : 'দৈনন্দিন জীবনে ইকবাল আমাদেরকে সাদাসিধে জীবন যাপনের শিক্ষা দিতেন। রসূল (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। তাঁর মতো

একজন আদর্শ মু'মিন, চিন্তাবিদ, ও শিক্ষাবিদ বর্তমান শতাব্দীতে বিরল।'

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী লিখেছেন :

“একবার পাজাবের এক ধনী লোক আইনগত পরামর্শের জন্য আল্লামা ইকবালকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। সাথে ছিলেন স্যার ফজলে হোসাইন ও আমরা দু'জন। রাত্রে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা হলো। ধনী লোকটির বিরাট প্রাসাদ আরাম-আয়েশের জায়গা। ইকবাল কাজ সেরে বেডরুমে ঘুমোতে গেলেন। আরাম-আয়েশের এত সামগ্রী দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। সুখের জন্য এ রকম বিছানা পেয়ে তাঁর মনে সাথে-সাথে উদিত হলো রসূল (সঃ)-এর কথা। ‘যে রসূলের বরকতে আমি এরূপ জান, মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছি, তিনি খেজুর পাতার বিছানায় শুয়েছেন’—এ খেয়াল আসতেই তাঁর চোখ পানিতে ভেসে গেল। অতঃপর সেই বিছানায় আর শু'লেন না। উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন এবং একটি চেয়ারের উপর বসে কঁাদতে লাগলেন। গভীর রাতে আমরা এ অবস্থা দেখে অনন্যোপায় হয়ে পড়ি। বাড়ির চাকরকে ডেকে বললাম, সাধারণ একটি চৌকি এখানে নিয়ে এস আর বিছানা পেতে দাও।’ এভাবে গোসলখানার এক পাশে শু'য়ে তিনি রাত কাটালেন।”

‘ইকবাল-সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এক পর্যায়ে লিখেছেন :

ইকবালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর সম্মুখে আহৃত হবার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে একটা ওদা-সীনের বিদ্রী় হাওয়া মানুষকে পীড়ন করে। হাঁকার নল মুখ থেকে সরিয়ে রেখে অসামান্য সন্তোহনের সহিত তিনি চৌকির উপর উঁচু হয়ে মানুষকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য কায়দায় এক-জন পাজাবী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে অর্ধশায়িত থাকেন। তাঁর হাসি মানুষকে স্বস্তি দেয়। নিখুঁত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন।’

কুরআনের প্রতি ভালবাসা

লাহোর তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল হেকিম মুহাম্মদ হাসান কারশী লিখেছেন : কুরআনুল করীম আল্লামা ইকবালের অত্যন্তপ্রিয় বস্তু ছিল।

তিনি ছোটবেলা থেকেই মধুর সুরে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওতে অস্তান্ত ছিলেন। তিলাওতের সময় তাঁর চেহারায়ে নূরের আভা ফুটে উঠতো। কখনও উৎফুল্ল চিত্ত অথবা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওত করতে না পারলে তিনি মনে খুবই দুঃখ পেতেন। তখন রীতিমতো তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। তিলাওতকালে গভীর মনোযোগ কুরআনের মর্মার্থের প্রতি নিবিষ্ট থাকতো। এমনকি অনেক সময় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অশ্রুতে ভিজ়ে যেত। তিনি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে যে কুরআন শরীফখানা তিলাওত করতেন তা লাহোর ইসলামিয়া কলেজের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এটা তাঁর নীরব সাক্ষী।

ব্যারিস্টার মীর্ষা জালাল উদ্দীন লিখেছেন : 'আল্লামা ইকবাল কুরআনের প্রতি সব সময়ই গবেষণা ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিলাওতের সময় মধুর উচ্চারণ ও অর্থের উপর ব্যাপক গবেষণা চালাতেন। নামাযের সময়ও কুরআনের আয়াত বুঝে বুঝে পড়তেন। মর্মার্থ উপলব্ধি করে আল্লাহর ভয়ে কঁদে ফেলতেন। তাঁর কন্ঠস্বরে একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে তিলাওতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত। এটা ছিল তাঁর আল্লাহ-প্রেম ও কুরআনের প্রতি গভীর ভাল-বাসার নিদর্শন। বস্তুত কুরআনের বরকতেই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।'

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণ করে বলেছেন : 'তিনি যা কিছু চিন্তা করতেন সবই কুরআনের আলোকে চিন্তা করতেন। যে পদক্ষেপ নিতেন তা কুরআনের ভিত্তিতেই নিতেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর চিন্তা ও কাজের সাথে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আজীবন তিনি এই আদর্শে অবিচল ছিলেন। দীর্ঘ-কালের ব্যবধানেও ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন কোন উচ্চ শিক্ষিত মনীষীকে দেখিনি, যার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি প্রাপ্ত কাব্য-প্রতিভা, পি. এইচ. ডি. ও বার-এট-ল ডিগ্রী রয়েছে।'

মাতাপিতার ইন্তেকাল

আল্লামা ইকবাল লাহোর সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিস্টারী করার সময় ১৯১৪ সালের ৯ই নভেম্বর সিয়ালকোটে তাঁর মাতা ইমাম বিবি ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক মোল বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে পিতা

শেষ নূর মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল এক শ' বছর। আশি বছর বয়স থেকে তিনি দুষ্টিগুণ্ডি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পারিবারিক তথ্য

আতা মুহাম্মদ ছিলেন ইকবালের বড় ভাই। আতা মুহাম্মদ ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইকবালের তেরো বছরের বড় ছিলেন। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি লগুনে বসবাস করতেন। ইকবালের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। ইকবালের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তিনিও ইন্তেকাল করেন।

ইকবাল দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ঘরে একজন সন্তান ছিল। তাঁর নাম আফতাব ইকবাল। তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করার পর লগুনে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দু'টো সন্তান। নাম জাভিদ ইকবাল (বর্তমানে তিনি লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি) ও মুনীরা বানু। তাঁর মৃত্যুকালে জাভিদের বয়স ছিল ১৪ বছর আর মুনীরার বয়স প্রায় ১০ বছর।

দশম অধ্যায় বিদেশ সফর

আমীর নাদির খানের আমন্ত্রণ

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। আল্লামা ইকবাল পেশওয়ার সফর শেষে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানিস্তান পৌঁছেন। শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁকে এ আমন্ত্রণ জানান। রাজধানী কাবুলে ইকবাল রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে দারুল আমানে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ডাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর রাস মসউদ, ও আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী। ডঃ গোলাম রসুল মিহর (বার-এট-ল) ও এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হাদী হাসান যথাক্রমে ইকবাল ও ডি. সি'র প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে ইকবাল এক সাক্ষাতে আমীর নাদির খানকে সবুজ মখমল মোড়ানো এক খণ্ড কুরআনুল করীম উপহার হিসেবে পেশ করে সান্ত্বনায়নে বললেন, ‘আল্লাহর বাণী এ পবিত্র মহাপ্রস্থ আপনাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উপহার দিলাম। এর প্রতি লাইনে বিশ্বের যাবতীয় গোপন রহস্য, জীবন সমস্যার সমাধান ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি বিদ্যমান। এ গ্রন্থই আমার একমাত্র সম্বল, আমি একজন ফকীর মাত্র।’

কাবুল সাহিত্য সংসদ আল্লামা ইকবালের সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সেরা কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তাঁর আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

সরকারকে শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ পেশ করে ইকবাল স্বদেশে চলে আসেন। ফেরার পথে তিনি গজনি ও কাপাহার সফর করেন। গজনির প্রসিদ্ধ মাযারসমূহ ও প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে সুলতান মাহমুদ গজনভী, হাকিম সিনাই (রঃ), হযরত আতাগজ বখশ (রঃ) ও তাঁর পিতার মাযার ঘিয়ারত করেন। সফরকালে তিনি মুসাফির নামে ফারসী ভাষায় দু'টি কবিতা রচনা করেন।

ইকবাল লাহোর পৌছার কয়েকদিন পর পত্রিকা মারফত জানতে পারলেন যে, দুষ্‌তিকাৱীদের অতর্কিত হামলায় আমীর নাদির শাহ শাহাদত বরণ করেন। (ইম্মা লিল্লাহি.....রাজেউন)। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে ইকবাল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

প্যারিস, ইটালী ও স্পেন ভ্রমণ

১৯৩২ সালে ইকবাল প্যারিসে নেপোলিয়ানের সমাধি পরিদর্শন ও সে দেশের প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ মেসিগনের সাথে সাক্ষাত করেন। এ বছরই তিনি ইটালী ও স্পেন সফর করেন। ইটালীতে মুসোলিনির সাথে সাক্ষাত করেন। স্পেনে সফরকালে 'দোয়া', 'মসজিদে কডোঁডা' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলো মুসলিম জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছে। তাঁর সফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্পেনের একটি প্রাচীন মসজিদে নামায আদায়। ক্রিসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর প্রায় পাঁচ শ' বছর উক্ত মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল। এ মসজিদের করণ পরিণতির সম্বন্ধে ইকবাল 'মসজিদে কডোঁডা' কবিতাটি লিখেন।

আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলনে

১৯৩১ সালের প্রথম দিকে ইকবাল ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত মু'তমার-ই-আলমে 'আল-ইসলামী' (ইসলামী বিশ্ব সম্মেলন-এ) যোগদান করে ভারত বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বছরই ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে যোগদান করেন।

১৯৩২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। এ বৈঠকসমূহে আহুত প্রিন্স আগা খান ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য পরামর্শ দান করেন।

একাদশ অধ্যায়

যুগান্তকারী দর্শন-তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-মানবতা ও মুসলিম জীবন ধারায় যে বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছে ইকবালের বাণী ও কাব্য এর যথাযথ সমাধান দিয়েছে। ফলে মুসলিম মিল্লাতের স্বকীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে ইকবালের চাইতে প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের অল্পই জন্ম হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য ইসলামের মর্মবাণী এমন যুগোপযোগীভাবে পেশ করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীতে অন্য কারও দ্বারা হয়নি। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মন-মগজ আস্তে আস্তে নানাবিধ ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত হতে লাগলো। প্রোটো, এরিস্টোটল, ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্ক্স, লেনিন, মুসলিনি, শোপেন হাওয়ার, হেগেল, মেকিয়াভেলী, হাকিন্স কান্ট, রুশো, নীটশে, প্লাটিনাস, স্পিনোজা, শেলিং, বার্মসোঁ, ব্রাডলি প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিক, সমাজ বিজ্ঞানী চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত মতবাদে বিশ্ব ছেয়ে গেছে। যুগ জিভাসার জবাবে ইসলামের শাস্ত্র আদর্শকে একটি অজ্ঞেয় ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে ইকবাল যে অমূল্য অবদান রেখেছেন, তার জন্য তিনি আমাদের কাছে অবিষ্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুসলিম বিশ্ব তথা এ উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রের তাঁর মতাদর্শ যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সুনিপুণ ভাবে।

মানুষ সম্পর্কে উপরিউক্ত দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি; কেউ বলেছেন, ‘মানুষ নিয়তিরই পুতুল; সুতরাং তাকে যা করানো হবে, তার জন্য সে বিন্দুমাত্র দায়ী হবে না।’ কেউ মানুষের যৌন সমস্যাতে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ বলেছেন, ‘মানুষ যতদিন বিধাতা বলে কাউকে বিশ্বাস করবে, ততদিন তার উন্নতির পথ রুদ্ধ।’ ইত্যাকার হাজারো মতবাদ

ও পাশ্চাত্য দর্শনকে ইকবাল শুল্কির দ্বারা খণ্ডন করে দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ একটি জাতি। পৃথিবীতে সে আল্লাহর খলীফা মনোনীত হয়ে এসেছে। আল্লাহ মানুষের ইচ্ছে ও কর্ম শক্তিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। সে-ই ভালমন্দ জান ও শুল্কির কণ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিজেই বেছে নেবে। ফলে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শিখবে। পক্ষান্তরে আখি-রাতে তার ভালমন্দের জন্য তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। তাছাড়া যৌন ও পেটের সমস্যা বড় নয়। এগুলো পশুদের প্রধান সমস্যা। মানুষের আসল সমস্যা হচ্ছে ঈমান আকীদার সমস্যা, আদর্শের সমস্যা।

ইকবাল ছিলেন খুদী বা ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত একজন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। আসরারে খুদীতে তিন কতই না সুন্দর করে লিখেছেন :

খুদী কো কর বুলন্দ এতনা কে হার তাকদীর ছে पहले
খোদা খোদ বান্দা ছে পুছে বাতা তেরী রেজা কিয়া হয়্য।

খুদী করো প্রসারিত—

বুলন্দ এমন শক্তিমান,

(যেনো) তকদীর লেখার আগে

খোদা তাঁর বান্দারে শুধান.

তোমার সম্বন্ধি কিসে

(বলো তুমি কিসে হও খুদী ?

আমার নিয়ামত দেবো

ছড়িয়ে বিপুল রাশি রাশি।)

তাঁর মতে ভিক্ষুক আজীবন ভিক্ষা করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। বরং ভিক্ষার ফলে গরীব আরো গরীব হয়। খুদীও অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়। অতএব আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় বা বিশ্বাস হারালেই মানুষের স্বয়ংস অনিবার্য। ধর্মকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের তথা সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। তিনি বলেন, 'শিশির কণাকে জমিয়ে নদীতে পরিণত কর আর মোমবাতির মত নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে অন্যকে আলো দাও।'

জীবন ও জগত সম্পর্কে এরকম হাযারো মতবাদকে খণ্ডন করে ইকবাল সমুচিত জবাব দিয়েছেন। তাঁর দর্শনের মূল উৎস ছিল কুরআন

ও হাদীস। তাই এক কথায় বলা যায়—ইকবাল নিছক একজন দার্শনিক, কবি, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ নন বরং তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের একজন মুখপাত্র ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

আলীগড় ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বোম্বায়ের প্রাক্তন শিক্ষা উপদেষ্টা কে. জি. সাঈয়িদাইন Iqbal's Educational Philosophy (ইকবালের শিক্ষা দর্শন) বইয়ের উপক্রমণিকায় লিখেন :

পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপূর্ব সুসংবাদ বহন করে আনবার জন্য ও নতুনতর মান স্থাপন করার জন্য এমন একজন অনন্যসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভাধর ডাবুকের আবির্ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে একটা প্রাকৃতিক অবদান। তাঁর চিন্তাধারা যত বেশী করে তাঁর সমসাময়িকদের কল্পনা, বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশি করে তার প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায় জীবন সায়াহ্নে

১৯২৩ সাল ইকবাল কঠিন মূত্রাশয় রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় দু'বছর দিল্লীর বিখ্যাত হেকিম নাবীনা সাহেবের চিকিৎসায় সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁর শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে। জগৎ স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি স্বীয় কর্মসূচী পরিত্যাগ করেন নি। সংগঠনের কার্যাদি সুচারুরূপে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দায়িত্ব পালনে তাঁর একটুও শিথিলতা ছিল না।

রোগ মুক্তির পর পরই তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর বিয়োগ বাথায় তিনি মুহামান হয়ে পড়লেন। মানসিকভাবে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অবশেষেও চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। রোগা ক্লিষ্ট প্রৌঢ় বয়সে তাঁর যখন সেবা শুশ্রূষাপরায়ণ লোকের প্রয়োজন দেখা দিল, তিক তখনি তিনি তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

১৯৩৪ সালে আবার মূত্রাশয়ের রোগ দেখা দিল। একই সাথে বাত রোগও। ফলে শারীরিকভাবে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। চলা-ফেরা করার শক্তি তো হারালেনই, সে সাথে কঠোর গুরু-গভীর উদাস্ত স্বরও হারালেন। এবার বুঝতে পারলেন, তাঁকে শীঘ্রই পরলোকে যাত্রা করতে করতে হবে। তাই ১৯৩৫ সালে সপরিবারে 'জাভিদ মনঘিলে' স্থানান্তরিত হন। এখানে কিছুকাল বসবাস করার পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাভিদেদে মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে ইকবাল আরো কাহিল হয়ে পড়েন। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে একে একে দু'জন সহধর্মিনীর ইন্তেকালের শোক সংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইকবাল এখন থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আফতাব ইকবাল লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. ও বার, এট-ল ডিগ্রী লাভ করে লন্ডনেই ব্যারিস্টারী করছেন, আদালতের কাজে তিনি ব্যস্ত।

জ্যেষ্ঠা কন্যা হস্তর বাড়ীতে। কনিষ্ঠ পুত্র আবির ইকবাল ও কন্যা মুনীরা জনৈকা মহিলার হাতে লালিত-পালিত হইল। কবি এ সময় দুঃখ-শোক ও রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে কালান্তিপাত করছিলেন। একান্ত অনুরক্ত ভৃত্য আলী বংশ তাঁর সেবায় নিয়োজিত।

ইকবাল এবার মৃত্যুর সুখ পান করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অসমাপ্ত কাজ গুটিয়ে আনছেন। সময় আসন্ন বুঝতে পেরে সমস্ত সম্পত্তির উইল প্রস্তুত করে রেজিস্ট্রি অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৩৫ সালে ‘ওসীয়াতনামা’ লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এদিকে দিন দিন রোগ বেড়ে যেতে লাগলো। অন্যদিকে আয়ুষ্কাল ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে আসতে লাগলো। জীবনী শক্তি নিজেজ-নিপ্পত্ত হয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কথাবার্তা ও আলোচনা কালে তিনি ক্লান্তি অনুভব করতেন না। যারা প্রতিদিন কবিকে দেখতে আসতেন তারা তাঁর রাজনীতি, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা শুনে কেউ বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, কবি ওরফতর রোগে আক্রান্ত এবং তিনি ভক্তদেরকে শোক সাগরে ডাসিয়ে টির বিদায় গ্রহণ করবেন।

মৃত্যু শয্যা

লাহোরের শ্বাতনামা ডাক্তার ও হেকিমগণ পালান্ধমে ইকবালের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগের অবস্থা ত্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডাক্তারগণ বুঝতে পারলেন—এটাই তাঁর মৃত্যু-রোগ। সুতরাং এ ব্যাধি আরোণ্য হবার নয়। কবি আর বেশীদিন ইহজগতে থাকবেন না। তাঁরা কবিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার দিনের অপেক্ষায় রইলেন। প্রখ্যাত হেকিম মুহাম্মদ হাসান কারশী প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কবির সেবা ও শ্রমায় নিয়োজিত থাকতেন। হেকিম সাহেব ছিলেন ইকবালের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম। তিনি তখন লাহোরে তিখিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল। তাছাড়া আরো অনেকে সাময়িকভাবে এসে শ্বেদ-মত করতেন এবং তাঁর ভানগর্ভ আলোচনা শুনতেন।

১৯৩৭ সালে মিসরের জামেয়া আছহারের শিক্ষাবিদগণ লাহোরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল নেহরু মুম্বই কবিকে দেখার জন্য লাহোর আসেন। এ বছর মার্চ মাসের প্রথম দিকে কবির রোগ আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেল। সমস্ত শরীরে ফুলা দেখা দিল

এবং হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পড়ল। অবস্থা এতই মারাত্মক আকার ধারণ করলো যে, তখন বিছানা থেকে উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত হারালেন। যৎসামান্য তরল পদার্থের খাদ্যপ্রব্য গ্রহণ হাড়া অন্য কিছু আহার বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার। যে হাদীয়া তোহ্ফা নিয়ে হাবির হস্তেন মহানুভব ইকবাল উপস্থিত লোকদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। শত চেষ্টা করে হয়তো তাঁর মুখে সামান্য আহার দেয়া হতো— অনাসক্তভাবে দায়ে ঠেকে তিনি কিছু খেতেন। আজ্ঞাহর এ কী রহমত! এ সময়ও কবির জ্ঞান-শক্তি সূচরুরূপে কাজ করে যাচ্ছিল। তাঁর চিন্তাপ্রসূত আলোচনা তখনও অব্যাহত ছিল। জীবন মৃত্যুর এ ক্রান্তি-কালের কঠিন মুহূর্তে তিনি মুখে মুখে ‘ইসলাম আওর কাওমিয়া’ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত হয়। (প্রবন্ধটি বাংলায় অনূদিত হয়ে ‘ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ’ শীর্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ‘ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র’ বইয়ে সংকলিত হয়েছে।)

৭ই মার্চ কবির একান্ত বন্ধু ও ডাক্তর অধ্যাপক গোলাম রসূল মিহর ও আবদুল আযীয তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁরা কবিকে চিন্তামুক্ত করার জন্য বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আপনি অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করবেন।’ তাঁদের কথা শেষ হতেই কবি বলে উঠলেন, ‘মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, বরং সানন্দে অভ্যর্থনা জানাবো।’

হিজায সফরের আশা

আজ্ঞামা ইকবালের মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল, হিজায সফর করবেন। হিজায বলতে বিশেষ করে মক্কা-মদীনাকে বুঝায়। আজ্ঞাহর ঘরের তাওফা এবং যিম্মারত ও মদীনা মুনাব্বিয়ার রওযা মুনাব্বিয়ার সফর করার বাসনা ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের। কবি তাঁর কবিতায় সেই জন্য হিজাযকে কোন ক্রমে ভুলতে পারেননি। হিজায সফরের জন্য তিনি বহুবার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন অসুবিধার কারণে যেতে পারেননি। হজ্জে যাওয়ার নিয়তেই তিনি ‘আরমুগানে হিজায’ ‘হিজাযের উপহার’ নামক কাব্য-গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে কিছু কিছু স্থান বাদ রেখেছেন হজ্জে গেলে সম্পূর্ণ করার আশায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর এই অন্তিম বাসনা পূর্ণ হলো না।

ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে উপস্থিত ডাক্তরদেরকে তিনি জানালেন,

‘সাহরানপুর থেকে আমার একজন বন্ধু চিঠি লিখেছেন যে, তিনি এবার হচ্ছে গিয়েছিলেন। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফকালে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ আমাকেও হচ্ছে যাওয়ার তওফীক দেন। তিনি বলেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দোয়া নিশ্চয়ই সাদরে কবুল হয়েছে।’ অতঃপর ইকবাল অশ্রুসজল নয়নে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, ‘বাহ্যিক অবস্থাদুগ্ঠে মনে হচ্ছে আমার হিজাব যাওয়া সম্ভব হবে না। বন্ধু লিখেছেন যে, দোয়া কবুল হয়েছে।’ দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।’

মৃত্যুর প্রহর ঘনিষ্ঠে আসছে

১৭ই এপ্রিল (মৃত্যুর চার দিন আগে) কবির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু খাতনামা দার্শনিকের সাথে ডারউইন ও নীটশের জটিল দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। শেষ অবস্থাতেও কবির বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি ও ভাবগভীর আলোচনায় সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। ইকবাল বুঝি এবার তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার অব্বেষণকারীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জ্ঞান গোপন করার ও নিয়ামতের যথার্থ প্রচার না করার অপরাধে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়।

ইকবালের দারুণ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে প্রবাস জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জার্মান পণ্ডিত ফ্রন ভেলসিম ২০শে এপ্রিল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে এলেন। দীর্ঘদিন পর উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন হওয়ায় পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলেন। ইকবাল ক্রান্তিহীনভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দার্শনিক মতবাদের উপর সফল আলোচনা ও মত বিনিময় হলো। মিঃ ভেলসিম বিদায়ের সময় কবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে ইকবাল বলে উঠলেন, ‘বন্ধু! আমি মুসলমান, মৃত্যুর ডয়ে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত নই। হাসি মুখেই তা গ্রহণ করবো।’

এদিন (২০শে এপ্রিল) উত্তর আফ্রিকায় প্রকাশিত একখানা ইংরেজী পত্রিকা ডাকযোগে কবির নামে এল। স্যার আবদুল কাদের তাঁর পাশে বসা ছিলেন। ইকবাল পত্রিকাটি পড়ে শোনানোর জন্য তাঁর হাতে দিলেন। তিনি প্রথমে একটি খবর পড়লেন যাতে লেখা ছিল :

‘উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা এক মহাসম্মেলনে ইকবাল, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ মনীষীদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছে।’ এ সংবাদ শুনে ইকবাল বলে উঠলেন, ‘আমি তো আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি। মিঃ জিন্নাহরই কেবল দায়িত্ব পালন করতে বাকী রয়েছে। এ জন্য মুসলমানদের উচিত তাঁর আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা।’

ঐ দিনই বিকেলে তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। মৃত্যু-শয্যার চার পাশে শত শত ভক্ত-অনুরক্ত কান্দছে আর আল্লাহর কাছে আশু রোগ মুক্তির জন্য মুনাজাত করছে। কারণ কবি তাদের মাতাপিতার মতই বেশী শ্রদ্ধার পাত্র, একান্ত আপনজন। তবুও নিয়তির লেখা ফেরানো যাবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

إذا جاء اجلهم لا يمتدخرون ساعة ولا يستقدمون -

‘যখন কারও মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত আগে অথবা পরে করা হবে না।’

দুনিয়ায় যত মনীষী এসেছেন আল্লাহর নিয়ম কারও বেলায়ই শিথিল করা হয় নি। কারণ সমস্ত সৃষ্টি মরণশীল।

আল্লাহ বলেছেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةٌ الْمَوْتِ -

প্রত্যেক সৃষ্টি জীবই মৃত্যুবরণ করবে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন :

كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَجَدَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

‘এ বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে আর বাকী থাকবে শুধু তোমার মহান প্রভুর আধিপত্য ও অস্তিত্ব।’

আল্লামা ইকবালের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও দুনিয়াবাসীকে শোক সাগরে ডাসিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন।

২০শে এপ্রিলের রাত এগারটার দিকে কবি চোখ বুঁজে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট থেমে গেল। ভক্তরা বললেন, এবার তাঁকে আরামে ঘুমোতে দেয়া ভাল হবে। সুতরাং লোকজনের ভীড়

কমানো উচিত। এটা মনে করে অনেকেই নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন। এভাবে কবিকে ফেলে যেতে কারও ইচ্ছে হচ্ছে না, তবুও কী আর করা যায়? পাশে শুধু রইলেন আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার।

রাত প্রায় শেষ। সময় আনুমানিক চারটা তিরিশ মিনিট। জীবনে সর্বশেষ বারের মতো ইকবাল ঘুম থেকে জাগলেন। জেগে পুনরায় হট্‌ফট্‌ শুরু করছেন। আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার ডাক্তারের নির্দেশিত নিয়মে রোগ যত্না উপশম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ সময় (মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে) কবি নিশুর দু'লাইনের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

شان مرد مومن با تو گویم

چو مرگ آید تبسم برب آبوست

‘ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে,

মৃত্যুকালে হাসিমুখে মৃত্যুকে যে বরণ করে।’

২১শে এপ্রিল ভোর পাঁচটায় কবি রাজা হাসান আখতারকে ডেকে বললেন, ‘আখতার। আমি কী অবর্ণনীয় অবস্থায় আছি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।’ এ কথা শুনে আখতার বললেন, ‘আচ্ছা, আমি এক্ষুণি হেকিম হাসান কারশীকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।’ এই বলে হেকিমের কাছে যেতে চাইলে কবি তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিশুর কবিতা আবৃত্তি করলেন : (মৃত্যুর দশ মিনিট আগে)

سرود رفته باز آید کردآمد - نسیم از حجاز آید که ناید

سرآمد روزگار این فقرے - دگردانائی راز آید که ناید -

জানিনা অতীত সূর আবার বাজবে কি না?

হিজায়ী হাওয়া পুনঃ এদিকে বইবে কি না?

এ দীন ফকীরের নিঃশেষ হলো জীবন

অপর রহস্য ভেদী (জানী) জানিনে জন্মে কি না?

তারপরও আখতার সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে হেকিমের কাছে ছুটলেন। পাশে আলী বখশকে রেখে গেলেন। আলী বখশ মাথার কাছে বসে একাকী শুধু আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করছেন। আর দোয়া-কালাম পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর কবি হাত-পা প্রসারিত করে উপরের দিকে চোখ

মেলে আলী বখ্শকে ডেকে বললেন, ‘আলী। আমার প্রাপ প্রদীপ একটু পরেই নিবে যাবে। আমি তোমাদের থেকে চির বিদায় নেবো। মনে কোন প্রকার কণ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও।’

এরপর ডান হাত ‘রাহের’ উপর রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, ‘আয় আল্লাহ। আমার এখানে সাংঘাতিক ব্যথা! সেই মুহূর্তে মুখমণ্ডলখানি কিবলার দিকে চলে পড়লো। আলী বখ্শ তৎক্ষণাৎ ডান হাত আবার বুকের উপর তুলে দিল। আল্লামা ইকবালের মুখে তখন স্মীত হাসির রেখা।

২১ এপ্রিলের সূবহে সাদিকের আলোতে পূর্বাকাশ ঝলমল হয়ে উঠলো। সময় সোয়া পাঁচটা। চারিদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে ‘আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর..... আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ আল্লামা ইকবাল আযানের সেই ধ্বনির সাথে সুর মিলিয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ কলমে পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইম্মা লিল্লাহি রাজেউন)

একটু পরেই পূর্বাকাশে উদিত হবে সোনালী কিরণ নিয়ে সূর্য। আর অন্য দিকে ইসলামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা আইনবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক শতাব্দীর প্রদীপ ডাক্তর মহাকবি ইকবাল চির নিদ্রায় শায়িত হলেন, যে নিদ্রা থেকে তিনি কিয়ামতের আগে আর জাগবেন না। ভক্ত-অনুরক্ত ও শিক্ষার্থীর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন না। মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবেন না। মুসলিম জাহানের প্রতি-নিধি হয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কোন বক্তব্যই রাখবেন না।

আলী বখ্শের তখনও বিশ্বাস হয়নি যে, কবি এখন আর বেঁচে নেই। তাই সে পাশের বাড়ীতে অবস্থানরত ডঃ আব্দুল কাইউম ও শফী সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসলো। তাঁরা এসে দেখেন, ইকবাল আর আমাদের মাঝে নেই। ইতিমধ্যে রাজা হাসান আখতারও হেঁকিম নিয়ে উপস্থিত। হেঁকিম হাসান কারশী শিরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা দিলেন। মৃত্যুকালে ইকবালের বয়স ছিল ইংরেজী

সন হিসেবে ৬৫ বছর ১ মাস ২৯ দিন আর হিজরী সন হিসেবে ৬৬ বছর ১মাস ২৪ দিন।

সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর লাহোর ও পাজাবের সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও মাগাসাসমূহ নজ্জ ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই সারা বিশ্বে এ খবর প্রচারিত হয়। সেদিন মুসলিম জাহানের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। আল্লামা ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম-বিশ্ব যেন পিতাকে হারালো।

কবি বলেছেন :

এমন জীবন হবে করিতে গঠন

মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন ॥

দাফন

ইশ্তিকালের পর চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন (এম. এ.) ও ডঃ মুজাফ্ফর উদ্দীন লাহোর শাহী মসজিদের পাশে হাজুরীবাগে তাঁকে দাফন করার স্থান নির্ণয় করে এলেন। কিন্তু পাজাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানের [অনুমতি ব্যতিরেকে সেখানে দাফন করা যাবে না। সুতরাং সবাই পরামর্শে মিলিত হলেন। সাইয়েদ মুহসিন শাহ, খলীফা শুজা-উদ্দীন, সা'দত আলী খান, মিয়া নিজাম উদ্দীন, মিয়া আমীর উদ্দীন, মাওলানা গোলাম মোরশেদ, মাওলানা আবদুল মজীদ, চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা গোলাম রসূল মিহ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ শাহী জামে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। যাতে দাফনের জায়গা চূড়ান্তভাবে নিদিষ্ট করা যায়। মসজিদের দরজার বাম পার্শ্বে যে জায়গাটুকু খালি ছিল সেটা তাঁরা উত্তম বিবেচনা করলেন। সুতরাং এবার দাফন করার অনুমতির জন্য তৎপর হলেন। পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল পাজাবের গভর্নরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তাঁরা পৌঁছেই গভর্নরের সাথে দেখা করে উক্ত জায়গায় তাঁর দাফনের অনুমতির জন্য আবেদন করলেন। জায়গাটি প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় দিল্লীর অনুমতির প্রয়োজন। গভর্নর অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে জোর সুপারিশ করে দুপুর বারোটার মধ্যে অনুমতি আনলেন এবং বিকেল চারটার মধ্যে অনুমতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথারীতি দিয়ে বিদায় করলেন।

নামাযে জানাযা

আল্লামা ইকবালের মরদেহ গোসল দেয়া হলো। গোসল শেষে জাতিদ মনখিল থেকে বিকেল পাঁচটার সময় দাফনের উদ্দেশ্যে খাটিয়া বের করা হলো। হাঘার-হাঘার ভক্ত-অনুরক্তরা সবাই খাটিয়া কাঁধে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন। তাই খাটিয়ার সাথে লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে দেয়া হলো। যাতে বেশী লোক কবির কফিন বহন করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়। শাহী মসজিদের দিকে জানাযা রওয়ানা হলো। পাঞ্জাবের গভর্নরের তরফ থেকে তাঁর চীফ সেক্রেটারী ও ডায়াল পুরের নবাবের পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারী খাটিয়ার উপর মল্যবান চানর ও ফুল স্থাপন করলেন।

রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমান জনতা খাটিয়ার উপর ফুল ও আতুর ছুঁড়তে লাগলো। সবার মধ্যে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। ভক্তরা খাটিয়ার পেছনে পেছনে হাঁটছে। মন্ত্রী-সেক্রেটারী, উকীল-ব্যারিস্টার, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী, কৃষক-মজুর ও সাধারণ মানুষ জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন। শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া প্রহরাধীনে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবকও নিয়োজিত করা হয়েছিল। অবশেষে কফিন জানাযার স্থানে পৌঁছলো।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ময়দানে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু জনতা সংকুলান হবে না দেখে দিল্লী দরওয়াজার কাছে উলুজ ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সেখানে লাশ পৌঁছলো। শুরু হলো নামাযের প্রস্তুতি। লোকের সমাগম বেশী হওয়াতে কাতার ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। রাত আটটার সময় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামায শেষে মুসল্লীদের মধ্যে কবিকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্য হিড়িক পড়ে যায়। অতঃপর রাত পোনে দশটার সময় লাহোর শাহী মসজিদের হাজুরীবাগে মহাকবি ইকবালকে দাফন করা হয়। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তিনি এখানে কবরবাসী হলেন।

ইকবালের মাযারে

আল্লামা ইকবাল নামযাদা কবি

মরেও অমর তিনি চিরদিনের রবি ॥

মহাকবি ইকবাল ছিলেন একজন অমর ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ ও রসুলের একজন ছাটি অনুসারী, একজন মকবুল বান্দা। তাঁর রূহানী শক্তি ছিল খুবই শক্তিশালী। ইসলামী সৃষ্টিবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম সংস্কারক। ইমাম গায্ফালী (রঃ)-এর পাঁচ শত বছর পর এরকম একজন মহাপুরুষ না এলে বিংশ শতকের মুসলমান ও ইসলামের কী দুর্দশা এবং বিকৃতি ঘটতো তা বলার অবকাশ রাখে না। জীবদ্দশায় যে ইকবাল আমাদের মাঝে ছিলেন মৃত্যুর পরও তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। নিশ্চয় কয়েকটি ঘটনা বেশ করছি :

মুরতজা আহমদ খান কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কোন এক রাতে ইকবালের মাযার ঘিয়ারত করতে গেলেন। যাতে তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে ও আল্লাহর ডয় সফারিত হয়। যখন তাঁরা মাযারের সন্নিকট পৌঁছলেন তখন দেখলেন—একজন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ ফকীর ইকবালের কবরের পাশে কুরআন তিলাওত করছেন। তিনি একগারা তিলাওত সমাপ্ত করে নিশুর আয়াতটি পড়লেন :

الا ان اولاء الله لا خوف عاهم ولا هم يحزنون -

‘জেনে রেখো! আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কোন ভয়-ভীতি অথবা চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।’

অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়িয়ে গেলেন আর নিশুর কবিতাটি পড়লেন :

چو باد باده نشستی و باد باده بعلای - به باد آرز باده بیهمارا -

তাঁদের মধ্যে একজন লোক এই ফকীরের পেছনে পেছনে গেলেন। ফকীর চুপে-চুপে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু উগর্যূপরি কয়েবার ডাকার পরও কর্ণপাত করলেন না।

মুরতজা আহমদ খান এভাবে প্রত্যেক রাতে তাঁর একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কবির মাযারে যেতেন। আরেক দিনের ঘটনা—

একজন ফকীর মাযারে মুরাকাবায় রত। এ সময় তিনি অনেক

দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন। অতঃপর দোয়া শেষে ফিরে যাওয়ার সময় নিশ্চুর আরবী কবিতা পড়লেন :

فطوى لبيت كبيت العتيق - حواله من كل فج عتيق -

এটা বায়তুল আতীক (বায়তুল্লাহ)-এর মতো সম্মানিত। এর কাছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত-প্রান্তর থেকে লোকেরা ছুটে আসে।

এ কবিতা শুনে মুরতজা খান চমকে ওঠলেন। কারণ তাঁর ধারণায় এ লোক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, অথচ এ রকম তত্ত্বপূর্ণ কবিতা।

মুর্তজা খান আরো বর্ণনা করেছেন :

আমি একবার খাটে শোয়া অবস্থায় অত্যন্ত অরস্তি বোধ করতেছিলাম। রাত তখন তিনটা। অন্তরে শুধু মরহুম কবি ইকবালের স্মৃতি উদিত হতে লাগলো। নিসঙ্গ অবস্থায় কবির মাথারের দিকে চললাম। এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন আমি কবরের সন্নিকট পৌঁছলাম তখন লাহোরের একজন মজযুব বুয়ুর্গকে দেখলাম। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। তিনি কবরের পাশে বসে কি যেন পড়ছিলেন। আমিও কবরের কাছে গিয়ে দূরা ফাতিহা পড়লাম। এ সময়ে তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর একান্ত দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুয়ুর্গের চক্ষুণ্ডয় রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে আর জ্বলজ্বল করছে। বিয়ারত শেষে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম—হজুর আপনি অকারণে কেন হাসছেন? এদিকে আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। তিনি চোঁচিয়ে জবাব দিলেন, 'তোমার জানা নেই—আজ রসূল (সঃ)-এর সওয়ারী এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমি এখানে তাঁর সন্মানার্থে পাহারাদার নিযুক্ত হয়েছি।'।

আমি বুয়ুর্গের এসব কথাবার্তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতে লাগলাম। ভয়ে আমার শরীর থেকে ঘাম ছুটেতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসলাম। সারা রাত খাটের উপর অচেতন অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু তখন অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম।

ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি

ইলমুল ইকতেসাদ

‘ইলমুল ইকতেসাদ’ আল্লামা ইকবালের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নূ‘মানী এ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় ইকবাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন : শ্রদ্ধাস্পদ জনাব মাওলানা শিবলী নূ‘মানীকে অশেষ শোকরিয়া জানাচ্ছি। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ বইয়ের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর ইলমুল ইকতেসাদ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার বিশদ রূপরেখা এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে। বইটি বর্তমানে দুপ্লাপ্য।

আসরারে খুদী

‘আসরারে খুদী’ ইকবালের একটি অনন্যসাধারণ কাব্য-গ্রন্থ। এটা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা জালাল উদ্দীন রামী (রঃ)-এর মসনভী শরীফের হন্দে ফাসী ভাষায় লিখিত। ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

খুদী অর্থ ব্যক্তিত্ব। মানুষের ব্যক্তিত্বের সমুন্নতি ও আগরণ ইকবাল কাব্যে অনুরণিত। আসরারে খুদীতে ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল-তত্ত্বগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাবনে গবেষণালব্ধ এক সুগাভকারী দার্শনিক মতবাদ এ কাব্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুবাদ ও জড়বাদী সত্যতার উত্থানে বিপর্যস্ত মানবতার খুদীর অবমূল্যায়নে ইকবাল দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর মানসপটে অংকিত মহিমাশ্রুত খুদীর বৈশিষ্ট্য রূপায়নে তিনি ‘আসরারে খুদী’ কাব্যখানি লিখতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দীর্ঘ দু’বছরে এটা রচনা সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

‘এটা লিখতে প্রায় দু’বছর কেটে গেল। রচনাকালে কয়েক মাসের বিরতিতে পুনরায় এ কাব্যের প্রতি ভাবাবেগে আসক্ত হয়ে পড়ি। ফলে কয়েক রবিবার (ছুটির দিন) ও কয়েক রাত্তি বিনিময় যাপন করে লেখা শেষ করেছি। যদি আরও সুযোগ পেতাম তাহলে সামগ্রিক দিক থেকে আমার এ মসনদীটি সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য লাভ করতো। এর দ্বিতীয় খণ্ডও রচনা চলছে। সেটা এর চাইতে সুক্ষতত্ত্ব সম্বলিত হবে।’

আসরারে খুদীতে কবি মানবিক সভার বিকাশের লক্ষ্যে পাখিব ধ্যান ধারণা বিবজিত তথাকথিত সুফী দর্শনকে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে ইসলামী দর্শনকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। যুক্তি দর্শনের আলোকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শায়ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রসূল (সঃ)-ই উন্নততম খুদীর (ব্যক্তিত্বের) অধিকারী। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উসুলায় হাসানার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

দর দু’আয়ে নুসরাতে তায়গে আমীন উ
কাতে’ নস্লে সালাতী’ তায়গে উ।
দর জাহাঁ আপিন নো আগায করদ
মসনদে আকওয়ামে পেশ দর নোরদ।
আয কলীদে দো’ দর দুনীয়া কুশাদ
হামতু উ বতনে উশ্রে গীতি নযাদ।
দর নেগাহে উ য়েকে বালা ও পুশত
বা গোলামে খোবেশ বরয়েক খাঁ নুশত।

—আল্লাহর কাছে সাহায্যের হাত বাড়ালে
তাঁর তরবারিই ‘আমীন’ বলে,
প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি
সমাপ্তির দিকে।

দ্বার উৎখাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের
ধর্মের কুজিকা দ্বারা,
বিশ্ব-গর্ভে কোন দিন জন্ম নেয়নি
তাঁর মত মহামানব।

তার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ ছিল সমান,
বসতেন তিনি আহারে তার ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায়।

আসরায়ে খুদীতে ইকবালের বিশ্বজনীন মতাদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, লণ্ডন-এর প্রফেসর ডঃ আর. এ. নিকলসন বইটি *Secrets of self* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের শুরুতে দীর্ঘ ২৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি কবির খুদী দর্শনের মনোজ ব্যাখ্যা দান করেন। অনুদিত গ্রন্থটি ১৯২০ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের অন্য একজন প্রফেসর ডঃ ডিকনসন ইকবালের চিন্তাধারায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং কবির উপর জাতিপূজার অপবাদ দেন। এর জবাবে ইকবাল ডঃ আর. এ. নিকলসনের নামে যে চিঠিটি লিখেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

আমি বিশ বছরাধিক কাল ধরে বিশ্বের খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতবাদ অধ্যয়ন করেছি। এতে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, এগুলোর কল্যাণী আদর্শ গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমিও কোন সোঁড়ামি দেখাইনি। আমার ফাদী কাবালুলোর সারবত্তা ইসলামের সপক্ষে ওকালতি করা নয়। বরং মানব সমাজের জন্য বিশ্বজনীন মতাদর্শ পেশ করা ও সামাজিক সৃষ্টি ব্যবস্থার অনুসন্ধান ছিল মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে গিয়ে বর্তমান জড়বাদী দর্শনের মূল্যায়ন করে বংশ, সম্পদ-মর্যাদা ও জাতি ভেদাভেদ বিলুপ্তি সাধন আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। এসব দার্শনিকের মতবাদের দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ব্যক্তি-গত জীবনে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা। দ্বিতীয়ত সামাজিক জীবনে পাখিব উন্নতি-বিমুখ হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা। সুতরাং এর কোনটিই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ইসলাম যে আদর্শ পেশ করেছে ইউরোপীয় সভ্যতায় সেটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আমরা তাদেরকে তা শেখাতে পারি।'

'আসরায়ে খুদী'তে ইকবাল মানুষকে কর্মবাদে উদ্দীপ্ত করেছেন। খুদীর পরিপুষ্টিতে মানুষের কর্মদক্ষতা হাসিল হয়। এ জন্য তিনি মুসল-মানদেরকে সৃজনশীল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের সার্থকতাই হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে। একমাত্র ব্যক্তিহ্রবোধই পারে

কাজের গতি সঞ্চার করতে এবং জীবনের সার্থকতা ফিরিয়ে আনতে ।
কাব্য-গ্রন্থের পূর্বাভাসে তিনি বলেছেন :

যরুরা আম মেহেরে মুনীর আন মন আস্ত
সদ সাহুর আন্দর কর বগানে মন আস্ত ।
খাকে মন রওশন তর আয জামে জম আস্ত
মুহরম আয নাজ আদহায়ে আলম আস্ত ।

—যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যাঙ্কল বিভ্রাময় সূর্য আমারই ;

বঙ্কা মাঝে আমার
শতক পূর্বাশার আলো ।

আমার ধূলিকণা—

জামশেদের সুরা পাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে ।

তিনি আরও বলেন :

ফিকরম আঁ আহো সর ফতরাক বস্ত
কো হোনুয আয নীস্তি বিরৌ নজস্তু
সবযানা রোয়েদাহ্ ঘের ওলশনম,
ওল বশাখে আন্দর নেহাঁ দর দামনম ।

—সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ,
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুপ্তান্নিত আছে
কতো অক্ষুট গোলাব ।

পূর্বাভাসের শেষাংশে লিখেছেন :

শায়েরী যী মসনভী মকসুদ নিস্ত
বৃত্ত পরস্তী বৃত্ত গীরি মকসুদ নিস্ত ।
হিন্দীম আয ফাসী বেগানা আম,
মাহে নো বাশম তী পয়মানা আম ।
ফিকর মন আয জলওয়া আশ মশহুর গশত
খামান্দে মন শাখ নখল তুরে গশত ।

—কাব্য-সৃষ্টি নয় এ মসনভীর লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।

ভারতবাসী আমি,
ফাসী নহে আমার মাতৃভাষা;
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
তুখু ফাসীই হলো এর বাহন।

সর্বশেষে বলেন :

খরদা বরমীনা মগীর আর হোশমন্দ
দিল বথেকে খরদায়ে মীনা ব বন্দ।

—ওহে পাঠক! দোষ দিও না
আমার সুরা পাত্র দেখে,
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

এ কাব্যের শেষ অধ্যায়ে ইকবাল জ্বালাময়ী ও মর্মস্পর্শী প্রার্থনার
মাধ্যমে ইতি টানেন। নিশ্চয় কিছু উদ্ধৃত করছি :

বাহ্ ঈ' আওরাক রা শীরাযা কুন
বাহ্ আঈন মুহব্বাতে তাযা কুন।
বাহ্ মারা বর হার্মা খেদমতে জুমার
কারে খোদ বা আশেকাঁ খোদ সেকার।
রহরোয়্য! বা মনযিলে তসলীমে বখশ
ইশকে বা আয শুগলে 'লা' আগাহ কুন
আশনায়ে রময 'ইল্লাল্লাহ্' কুন।

—বৈধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পত্ররাজিকে
পুনর্জাগ্রত করো প্রেমের নীতি।
টেনে নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো
তোমার সেবায়,
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে
প্রেম করে যারা তোমায়।
দাও আমাদেরকে ইব্রাহীমের

সেই বলিষ্ঠ ঈমান,
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা ইলাহা'র অর্থ—
পরিচিত কর আমাদেরকে—
'ইল্লাল্লাহু'র রহস্যের সাথে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান বেশ কয়েকটি ভাষায় এ কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। আসরারে খুদী ও রুমূযে বেখুদী (দু'খণ্ড একত্রে) আবদুল ওহ্‌াব আযযাম কর্তৃক আরবীতে অনূদিত হয়ে 'দিওয়ান আল-আসরার ওয়াল রুমূয' নামে দারুল মা'আরিফ, কায়রো, মিসর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন মুহাম্মদ বখশ ওয়াসিফ। ডঃ আলী নিহাদ তারলান Esrar ve Rumuz নামে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত বইটি ১৯৫৮ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া জার্মান ও ফরাসী ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে বলে জানা যায়।

রুমূযে বেখুদী

ইকবালের খুদী দর্শনের সাড়া জাগানো দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'রুমূযে বেখুদী'। আসরারে খুদীর ভূমিকায় কবি এ গ্রন্থেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে খুদী সিরিজের ২৮ খণ্ড হিসেবে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। কাব্যের ভাষাও ফার্সী। রুমূয-ই-বেখুদী অর্থাৎ 'আম্ব বিলীন'ের রহস্য।'

ইকবাল আসরারে খুদীতে নিরপেক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব জাতির শাস্ত্রত আদর্শ কি হবে তার আলোচনা করেছেন। আর সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন দর্শনকে তুলে ধরেছেন। রুমূয-ই-বেখুদীতে সেই শাস্ত্র ও চিরন্তন আদর্শকে রূপায়নের লক্ষ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে আল্লাহু'র একনিষ্ঠ আনুগত্য ও রসুল (সঃ)-এর রিসালতের অনুসরণের মধ্যে বিলীন করে দিতে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। তাওহীদবাদে উজ্জীবিত মানব সত্তা নবীর শাস্ত্র আদর্শ অনুসরণে হতে পারে 'ইনসানে কামিলের প্রতিভা'।

মানুষের স্বাধীনতা সাম্য প্রতিষ্ঠার ও কল্যাণে জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তার নাম আল-কুরআন। পঞ্চাঙ্গুরে মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন আল-কুরআনের আদর্শিক বাস্তবতা—মূর্ত প্রতীক। ইকবাল বিশ্বব্যাপী অশান্তির

হাহাকার রূপ দেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর নেতৃত্ব ও শাসন-প্রশাসনের জন্যে আল-কুরআন, মুহাম্মদ (সঃ) ও বিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগের প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। মুমিনদেরকে আত্মশক্তিতে বলীমান হয়ে সে আদর্শ গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবির দু'একটি কথা এখানে প্রবিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

‘আমার ধারণায় রুমুযে বেখুদী কাব্যখানি লেখায় ইতি টেনে-ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো দু’তিনটে বিষয়ের জন্যে কাব্যটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। কুরআন, বায়তুল্লাহ শরীফের মহাশায়া, মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে—কবিতাগুলো পরে সংযোজন করেছি। এতে গ্রন্থটির প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটেছে।

এখন আমার মনে হচ্ছে, গ্রন্থটি মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলকধাঁধায় যারা ঘূরপাক খাচ্ছে তাদেরকে পথের দিশা দেবে। কারণ আমার স্বতটুকু মনে হয়, ইতোপূর্বে ইসলামী জীবন দর্শনকে এত শিল্পিত অবয়বে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। ফলে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের এটা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল প্রত্যয় জন্মাবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা আজকে জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তা দুর্বল গাঁথুনির নড়বড়ে কুঁড়েঘর মাত্র। জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের রূপরেখা একমাত্র ইসলামই চূড়ান্ত করেছে, যার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ চেতনা সময় বা যুগের অতিক্রান্তিতে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে না।’

কাব্যের শুরুতে ‘মিল্লাতে ইসলামিয়ার সমীপে নিবেদন’ কবিতায় মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

আয় তরা হক খাতেমে আকওয়াম করদ

বরতু হো আগায রা আন্জাম করদ।

—তোমায় খোদা সৃষ্টি করেন পূর্ণতম শ্রেষ্ঠ জাতি,

তোমার মাঝে হরেক আদি সফল লভি পূর্ণ ভাতি।

আল-কুরআনের ভাষায় ‘খায়রে উম্মাতিন’-এর প্রতিধ্বনি করে কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি এ কবিতায়। খায়রে উম্মত হওয়ার অনিবার্য শর্ত হলো রসূল (সঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানা—সর্বোত্তম আদর্শের নিষ্ঠা-পূর্ণ অনুসরণ ও প্রাণাধিক ভালবাসা। বস্তুত রসূল প্রেমের দহনই মুসলিম মিল্লাতের ঈমানী শক্তিকে মহীয়ান-গরীয়ান করে তুলতে পারে তাই

তিনি বলেছেন :

রমযে সুখে আয পরওয়ানায়ে
দর শরর তায়ীর কুন কাশনায়ে ।

তরহে ইশকে আন্দায আন্দর জানে খোবীশ
তাযা কুন বা মুস্তফা পয়গম্বা খোবীশ ।

—পতঙ্গেরই দহন দেখে মর্ম দহন গিফা করো,
অগ্নিশিখার কেন্দ্র মাঝে আবাস তব গঠন করো ।

আপন প্রাণের গোপন কোণে প্রেমের ভিত্তি গঠন করো,
নবীর সাথে শপথ তব আবার তুমি নূতন করো ।

আবার বলেছেন :

তায খাকত লালাহ্ বার আরদে পদৌদ
আয দমত বাদে বাহরে আয়দ পদৌদ ।

—মৃত্তিকাতে তোমার যেন পুষ্প ফোটে নূতন করে,
তোমার স্বাসে মধুর মলয় বয় যেন গো নূতন করে ।

পরিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত ও পদস্থলিত মুসলমানদের জন্য সিরাতুল মুস্তা-
কীমের আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহ্‌র কাছে আহাজারির সুরে মুনাজাত
করেছেন :

আয পয়ে কওমে যখোদনা মহরমে
খাস্তীমে আয হক হায়াতে মাহকমে ।

দর সকূতে নীম শব নাজা বুদ্ধম
আলম আন্দর খাব ওমন গুরীযা বুদ্ধম ।

জানম আয সবর ও সকূ মাহরাম বুদ্ধম
দরদ মন ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু বুদ্ধম ।

—আত্ম সত্তার অজ্ঞ ঘৃমস্ত এই জাতির তরে,
যাওয়া করি—দাও হে খোদা, সবল-সফল জীবন তারে ।

অর্ধ রাতের নিষুমু ক্ষণে বিলাপ করি করুণ স্বরে
'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' বঙ্ক ভাসাই নয়ন-লোরে ।

বঞ্চিত মোর পরাগখানি ধৈর্য এবং শান্তিহীন
হে চিরজীব ! হে চিরন্তন, জপ করছি রাত্রি দিন ।

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার পাদমূলে তিনি জুদী-বেখুদীর মর্যোচ্ছাটন
করে বলেছেন :

নকশে গীর আন্দর দিলশ 'উ' মী শুওদ
মন বহম মী রীযদ ও 'তু' মী শুওদ ।
জবর কতা ইখতিয়ারশ মী কুনদ
আহ মুহকত মায়া দারশ মী কুনদ ।
নায তা নায আস্ত কুম খীযদ নেয়ায
নায হা সাযদ বহম খীযদ নেয়ায ।
দর জামা'আত খোদ শিকন পরদিদ খুদী
তায গুলবর গে চেমন গরদিদ খুদী ।
নুকতায়ে হা চো' তায়গে পোলাদ আস্ত তেয
গরনমী ফাহমী যপেগ মা গুরেয ।
—'তিনি'র মোহর অন্তরে তার অংকিত হয়,
'আমি' বিচূর্ণ হলেই 'তুমি'র অভ্যাদয় ।
বাধ্যকতা ইচ্ছা তাহার খর্ব করে,
প্রেমের ধনে ধন্য সে হয় গর্ব করে ।
নয় হবে না অভিমান যবে চাও তবে,
ভুলে যাও মান, বিনয় তান জন্ম লবে ।
সস্তা সে করে আত্মবিলোপ সংঘ মাঝে,
পত্র সে হবে পুষ্পমালা কানন মাঝে ।
"তীক্ষ্ণ জৌহ অসির মত সূক্ষ্ম কথা ;
যাও দূরে—না বুঝলে যদি গোপন ব্যথা ।

বাগে দরা

বাগে দরা কাব্য-গ্রন্থটি মূলত ইকবালের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর একটি সংকলন। ১৯২৪ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, খিযির রাহ, তুলুয়ে ইসলাম—এ চারটি দীর্ঘ কবিতাও পরবর্তীতে এর সাথে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাড়া জাগানো কবিতাগুলো এতে সংকলিত হওয়ায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাগে দরার কবিতাগুলো রচনা কালক্রম অনুসারে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

প্রথমত, কাব্য-চর্চার সূচনাকাল থেকে ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ সফরে যাওয়া পর্যন্ত। এ সময়কালে আমরা ইকবালকে

একজন খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে দেখি। নয়া শিওয়াল (নতুন শিবালয়), হিমালাহ্ (হিমাশ্রয়), হিন্দুস্তানী কওমী গীত (ভারত-সঙ্গীত), হিন্দুস্তানী বার্দো কী কওমী গীত (ভারতীয় বিত্তবের জাতীয় সঙ্গীত) ইত্যাদি কবিতাগুলোতে স্বদেশ-প্রেমের অনন্য অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপের প্রবাস জীবন (১৯০৫-১৯০৮)। প্রবাসী ইকবাল রচিত কবিতা ও ভারতীয় ইকবালের কবিতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিগণিত হয়। ইউরোপে যাওয়ার পর দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নিষ্ফল ও তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখে তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদে উরু হন। এ সময়ের রচিত জঘীরায়ে সিসিলিয়া (সিসিলি দ্বীপ), হাকীকত-ই-হসন (সৌন্দর্য তত্ত্ব), ওয়াতানিয়াত (ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ), তোলাবায়ে আলীগড় কি নাম (আলীগড় ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এ সব কবিতার ক্রমানুসারে তাঁর চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও প্রসারতার ছাপ সুস্পষ্ট। বস্তুতপক্ষে তখন থেকে পরবর্তী সব কবিতার আঞ্চলিক 'স্বদেশ'-এর বিকল্প রূপের 'স্বজাতি'র সমৃদ্ধির কথাই মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

তৃতীয়ত, এ পর্যায়ের কবিতাগুলোতে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর একান্ত প্রীতি ও আন্তরিকতার মহান বানী ভাবের হয়ে রয়েছে। কবি স্বজাতির গৌরবময় অতীত ও সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের বিজুত রূপরেখা পেশ করেছেন সুনিপুণভাবে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে তারানা-ই-মিল্লী (জাতীয়-সঙ্গীত), শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (অভিযোগ ও অভিযোগের জবাব) শবে মি'রাজ (মি'রাজ রজনী), দোয়া (প্রার্থনা), তুলুয়ে ইসলাম (ইসলামের উত্থান), খিযির-ই-রাহ (পথের দিশারী), বিলায়ে ইসলামীয়া (ইসলামী রাষ্ট্র) ইত্যাদি। এ সব কবিতায় ইসলামের শাস্ত ও চিরন্তন আহবানের আলোকে 'হেরার রাজ-তোরণে'র পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি।

ভারতবর্ষের শাসন-কর্মতা ইংরেজদের পদানত হলে রাজ্যহারা মুসলমানরা অপাংক্বেয় হয়ে পড়ে। তাদের পূজিত হতাশার স্তূপে ইকবাল নাড়া দেয়ার লক্ষ্যে হিমালাহ্ (হিমাশ্রয়) কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় তিনি ভারতের মুসলমানদেরকে বিস্মৃত অতীত-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমাশ্রয়ের প্রতীক চয়ন করেছেন, যাতে তারা আত্মসম্মিৎ ফিরে পায়।

কবি ক্ষমতাদ্রুত হতাশগস্ত জাতিকে অজুলী-নির্দেশ করে বলছেন, হিমালয় যেমন সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিসেবে তোমানের জন্মভূমিতে শির উঠু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি তোমরাও বিশ্বের সর্বোচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন-সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, আর এই ভারত-ভূমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি। আকাশ যেমন হিমালয়ের ললাট চূড়ন করছে তেমনি অন্যান্য জাতির তোমাদের জ্ঞান গরীমায় মুগ্ধ ছিল। সুতরাং তোমরা এদেশে ঘর জাহাই নও। কবিতার গুরুত্বে বলছেন :

আয় হিমালাহ্ ! আর ফসীলে কিশওরে হিন্দুস্তা
চোমতা হে তেরী পেশানী কো জুক কর আগম',
তুজ মে কুচ পয়দা নেহী' দেহীনাহ্ রোহী নিশা
তু জোয়া হে গরদিশে শাম ও সেহের কি দরমিয়া'।
এক জলওয়া থা কলীমে তুরে সীনা কি লিয়ে
তু তজরী হে সরাফা চশমে বীনা কি লিয়ে।

—হিমালয়, হিমালয় ! হে ভারত নগর-প্রাচীর,
আনত আকাশ চুমে সোঁহ তুরে তব উচ্চশির।
কাল একে দেয় নাই তব বয়সের অর,
দিবা রাগি চক্রাবর্তে আজো তুমি যৌবন-শিহরা।
মুসার দৃষ্টিতে ছিল ক্ষণজ্যোতি 'সিনাই' পাহাড়,
আপাদমস্তক তুমি জ্যোতিঃমান নয়নে সবার।

দুর্জয় সাহস ও পরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলে ঔপনিবেশিক শক্তি পিছু হটতে বাধ্য। তাই ভারতবাসীকে তিনি আন্দোলিত করে তুলছেন :

আবর কি হার্তো মৌ রাহওয়ার হাওয়া কি ওয়াস্তে
তাযা যা ন পে দিয়া বরকে সর কো সার নে।
আর হিমালাহ্ ! কুদী বাহী গাহ্ হে তু বিহী জিসে
দস্তে কুদরত নে বনায়া হে আনাসের কি লিয়ে।
হায়ে কি করতে তরব মৌ জুমতা জাতা হে আবর।
ফীলে বে যনজীর কি সুরতে উড়া যাতা হে আবর।

—মেঘেদের হাতে দেয় চুড়া তব বিদ্রোহের কশা,
তাড়িত তুরঙ্গ বায়ু হেঁসে ছুটে শিহরি' সহসা।

হিমালয়, হিমালয়। তুমি সেই লীলা-নিকেশন,
 ক্ষিতি তেজ আদি যেথা কীড়া-সুখে করে বিচরন।
 আহা! কিবা মহানন্দে পূজা মেঘ ভেসে চলে যায়,
 মুক্ত করীদল যেন আকাশেতে উড়িয়া বেড়ায়।

পরিশেষে তিনি কাছিত লক্ষ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে বলছেন :

হা দেখা দে আল তসওওর। ফের উওহ সুবহে ও শাম তু
 দৌড় লিছে কি তরফ আয়ে গারদিশে আইয়াম তু।

—হে কল্পনা দেখাও সে সন্ধ্যা আর প্রভাত নিচয়,
 অতীতে ফিরিয়া চল ওগো কাল আবর্তনময়।

‘হিন্দুস্তানী বাচোঁ কি কওমী গীত’ কবিতায় ভারতবাসীদের মিলন-
 সুরে আহ্বান করেছেন। সঙ্গীতের আখ্যান ভাগে কবি গাইলেন :

চিশতী নে জিস্ স্বমী মৌ পরগামে হক সুনায়,
 নানক নে জিস্ চমন মৌ তওহীদ কা গীত গায়,
 তাতারীয়েঁ নে জিস্কে আপনা ওয়াতন বানায়,
 জিসনে হিজাবীয়েঁ সে দশ্তে আরব চুড়ায়,
 মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়।

—চিশতী শোনাল যে ভূমিতে সত্যের বাণী প্রেমের হলে,
 তাওহিদী গান গাহিল নানক যে দেশের শ্যাম কানন তলে;
 তাতারবাসীরা বলেছিল যারে আপনার প্রিয় স্বদেশ বলে,
 মরুর মুক্তি তুলিল হিজাববাসীরা যাহার রিঙ কোলে;
 সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি।

স্বদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন :

ইউনানীয়েঁ কো জিস্ নে জীরান কর দিয়া থা
 সারে জাঁহা কো জিস্ নে ইলম ও হুনর দিয়া থা।
 মেট্রি কোন জিস্ কি হক নে বর কা আসর দিয়া থা
 তুরকোঁ কা জিস্ নে দামন হীরেঁ সি বহর দিয়া থা
 মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়।

—প্রতিভায় যার তাক লেগেছিল জানী-গণীদের সুনান দেশে,
 সারা পৃথিবীরে দিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান যে গো, মধুর হেসে;
 পরশ যাহার তুচ্ছ মাটিরে বানাজ বিশাল গোনার খনি,
 তুর্কবাসীরা দু’হাত ভরিয়া তুলিয়া দিল যে হীরক মণি,
 সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি।

‘হিন্দুস্তা কি কওমী গীত’—এ তিনি স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে গাইলেন :

সারা জাহাঁ সে আত্মা হিন্দুস্তা হামারা
হাম বুজবুলে হাঁয় উসকে, ইয়েহ্ গুলিস্তা হামারা

—সবার সেরা ডারত আমার .

জন্মভূমি অতুল,
সে যে আমার উদ্যান আর
আমি তার বুলবুল ।

তসবীর-ই-দরদ কবিতায় কবি সেই পুণ্য জন্মভূমির পরাধীনতার দুখে
গাঁথা জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি
বিলাপ করছেন :

ইলাহী ফের মহাহ কিয়া হাঁয় ফেহাঁ দুনিয়া মে রহনে কা
হান্নাতে জাবিদা মেরী নহ্ মুরগ না গাহাঁ মেরী
মেরা রোনা নেহী, রোনা হে ইয়ে সারে গুলিস্তা কা
উওহ্ গুল হো মার, খুয়া হর গুল কি হে গোয়া খুয়া মেরী ।

—প্রভু হে, আমার কি সুখ বল তো এই দুনিয়ান্ন বাঁচিয়া থাকা,
জীবনে-মরণে যেখানে কোথাও অধিকার কিছু যায় না রাখা ।
আমার রোদনে শুধু আমি নই—সারা বনভূমি কাঁদিছে হায় ।
আমি সেই ফুল হেমন্ত যার প্রতিটি ফুলেরে কাঁদায় ।

স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা মস্ত্রে উত্তুদ্ধ করে কবি বলছেন :

ইয়ে খামুশী কাহাঁতক, লজ্জতে ফরিয়াদ পরদা কর
যমো পর তুহো আওর তেরী সদা হো আসমানোঁ মে ।
নহ্ সমঝো গি তু মিট জাও গি আর হিন্দোস্তা ওয়ালো
তোমারী দান্তা তক ভী নহ্ হোগী দান্তানোঁ মে ।

—কতকাল আর নীরব থাকিবে ? ফরিয়াদ নিয়ে দাঁড়াও সব,
মাটিতে থাকিয়া বিপুল শুন্যে প্রেরণ কর গো তোমার রব ।
এখনো যদি না বুঝিয়া থাক হে স্বদেশবাসী, শোন গো তবে,
আগামী দিনের ইতিহাস মাঝে নামটুকু তব নাহিক রবে ।

দ্বিতীয় ভাগের ওয়াতানিয়াত কবিতায় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের
মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন। তিনি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে
দেখলেন, দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সব বিপর্যয়ের মূল। সারা বিশ্বের

মুসলিম একটি দেহের মত। পবিত্র হাদীসেও বলা হয়েছে তা-ই। মু'মিনদের উদাহরণ হচ্ছে একটি প্রাসাদের মত। এর একটি ইউ যেমনি অন্যটির সাথে সম্পৃক্ত তেমনি বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তরে অবস্থানরত অব-হেলিত মুসলমানরা জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পতাকা তলে সমবেত হ'উক—এটাই কবির একান্ত কাম্য। সুতরাং তিনি দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন :

উন তাযা খোদাত্‌ মৌ বড়া সব সি ওয়াতন হে
জো পিরহন সি কা হে উওহ্‌ মঘহাব কা কাফন হে।

—সব দেবতার দেরা দেবতা, যাহারে কহিছ স্বদেশ ফের,
বসন তাহার বনেছে কাফন আবারি বদন ইসলামের।

হো কায়দে মকামী তু নতীজা হে তবাহী

রহ্‌ বাহর মৌ আযাদ সুরতে মাহী

—স্থানের শিকলে বন্দী যদি গো হও তুমি তবে বিলীন হবে,
অকূল জলধি মাঝে বাস কর মীণ সম এই বিপুল ভবে।

আকওয়ামে জাহাঁ মৌ হে রিকাবত তু ইসি সে

তসখীর হে মকসুদে তেজারত তু ইসি সে।

খালি হে সদাকত সি সিয়াসত ইসি সে

কমযোর কা ঘর হোতা হো গারত ইসি সে,

আকওয়াম মৌ মখলুকে খোদা বটতী হে ইসি সে

কওয়ায়ত ইসলাম কি জড় বটতী হে ইসি সে।

—ভুল বুঝাবুঝি যত এরি লাগি, জাতি-বিদ্বেষ ও হানাহানি,

বাণিজ্য জাল বিস্তার লাগি প্রয়োজন হলো জন্মের ঘানি।

ইহারি কারণে রাজনীতি হতে দূরে পালিয়েছে সততা যত,

এরি ফলে আজ হতেছে ধ্বংস গরীবের প্রিয় কুটির শত।

খোদার সৃষ্টি মানুষ জাতিটি দেশের টানেতে শতধা হয়,

মহান দ্রাভ ভাবধারাবাহী ইসলাম এতে হয় যে লয়।

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ বিমুখ কবি অনুপম আন্তর্জাতিকতাবাদে।

উদ্ধৃদ্ধ হয়ে 'তারানা-ই-মিল্লী'তে বলেছেন :

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তী হামারা,

মুসলিম হেঁ হাম ওয়াতন হে সারা জাহাঁ হামারা।

তাওহীদ কি আমানত সীনে' মৌ হে হামারে,

আসা' নেহী' মিটানা নাম ও নিশা হামারা ॥

—আরব মোদের চীনও মোদের, মোদের হিন্দুস্তান,
মুসলিম মোরা বিশ্ব জগত মোদের বাসস্থান ॥
বক্ষে আমার তাওহীদের রয়েছে আমানত,
নয়কো সহজ মিটিয়ে দেওয়া মোদের নাম-নিশান।

যেহেতু কবি ও মুসলিম মিল্লাত অমিত তেজা বীর পুরুষের উত্তরা-
ধিকারী। তাদের শিরাই শহিদী খুনের ধমনী সংযুক্ত। সুতরাং তিনি
বলেছেন :

তায়গোঁ কে সায়ে মেঁ হাম পল কর জোয়াঁ হোয়ে হেঁ,
খজরে হেলাল কা হেঁ কওমী নিশাঁ হামারা।
মগরিব কি ওয়াদিওঁ মেঁ গোজী আয়াঁ হামারি,
খম্তা ন থা কিসি সে সায়েলে রওয়াঁ হামারা।

—শিশুকাল হতে হয়েছি জোয়ান তরবারি-ছায়া শিরেতে ধরে,
নতুন চাঁদের খজর শোভে আমার জাতীয় পতাকা 'পরে।
ইউরোপ ভূমে গিরি-প্রচ্ছায় ধ্বনিয়া তুলেছি আযান সুর,
কিছুতে পারেনি ধাবমান গতি রুখতে আমার,—লক্ষ্য দূর।
মিথ্যার কাছে পরাজিত হব? দৈব বিপাক, আমি যে নই,
শতবার তুমি পরধ-নিরিখ করিয়াছ যারে, আমি সে হই।

আয় আরদে পাক তেরী হরমত পেহ্ কট্ মরে হাম
হেঁ খোঁ তেরী রগোঁ মেঁ আবতক রওয়াঁ হামারা

—হে পবিত্র ভূমি। তোমার ইজ্জতের জন্য করেছি মোরা রক্ত দান,
সে রাঙা শোণিত ধমনীতে তব অজিও প্রবহমান।

বাগে দরা কাব্যখানি থেকে সংকলিত কবিতার ইংরেজীতে অনুবাদ
করেছেন V. G. Kirnan। অনুদিত সংকলনের নাম 'Poems of Eqbal'।
Dr. H. T. Sorle-ও নির্বাচিত ২১টি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করে-
ছেন। তা Aberdeen University Press থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত
হয়। ডঃ মুহাম্মদ বাকির ও প্রফেসর ইউসুফ সেলিম চিশতী এ বইয়ের
দু'টি পৃথক-পৃথক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। দু'টোই ১৯৫১ সালে লাহোরে
প্রকাশিত হয়।

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া

‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’ ইকবালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতাসমূহের অন্যতম। এ দুটি কবিতাই আজমানে হেমায়েত-ই-ইসলামের সভায় যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১২ সালে পঠিত হয়েছিল। ‘শেকওয়া’ পাঠে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এটার জন্য ইকবালকে যে প্রবল বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অন্য কোন লেখার জন্য সে রকম হয়নি।

শেকওয়া মানে অভিযোগ—আল্লাহর নামে অভিযোগ। ৩৬টি শবকের দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে কবি তিমির-তাড়িত দুর্দশাপ্রাপ্ত মুসলিম জাতির করুণ পরিস্থিতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহর নামে অভিযোগ পেশ করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অভিযোগগুলো অত্যন্ত শ্রুতিকটু। প্রতিবাদের মূলে ছিল এটাই।

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দুই প্রেমিক হৃদয়ের মান-অভিমান উপজীব্য বিষয়। কবিরা তেমন কোন এক প্রেমিক সত্তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে তা রসঘন করে উপস্থাপন করেন। ইকবালের পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহ রব্বুল ‘ইয়মত’। তাঁর প্রতিই তাঁর মান-অভিমানের কথামালা। স্বজাতির চরম দুর্দশা দর্শনে মর্মান্বিত হৃদয় নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নালিশ করেছেন। মুসলমানের এহেন অবস্থা সত্ত্বেও তিনি কেন নিবিকার—এটাই কবির মর্মবেদনার কারণ। তিনি বলেন :

জুরআতে আমুয মেরী তাবে সুখন হে মুজকো
শেকওয়া আল্লাহ্ সে খাকম বদহ্ন হে মুজকো।

—বাক শক্তি নিভীক আমায় করছে এই ধরা ধামে,
ছাই মুখে হটুক তাই করছি শেকওয়া আজি খোদার নামে।

সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কবির মর্মবেদনা লাঘবের জন্য তিনি অভিযোগের পথই বেছে নিলেন। তিনি বলেন :

আয় খোদা শেকওয়া আরবাবে ওফা ভী সুনলে
খোগর হামদ্ সে তোড়া সা গেলাহ্ ভী সুনলে।

—আল্লাহ্! এবার বন্ধ মুখে অনুযোগের কেন্দ্রা শোন
নিভা যারা গুণ গাহিছে, বারেক তাদের গেলাহ্ শোন।

যে জাতি আজ ধ্বংসোন্মুখ সে জাতির কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ তিতিকার ফলে আল্লাহর তাওহীদ ও খিলাফত বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ আজ তারা পদদলিত হচ্ছে চরমভাবে। তাই কবিতায় প্রেমাপ্পদের কাছে অভিযোগের সুরে বলছেন :

তুজকো মা'লুম হে লেতা খা কুয়ী নাম তেরা
কুওওতে বাযুয়ে মুসলিম নে কিন্না কাম তেরা।

... ..

নকশে তাওহীদ কা হার দিল পেহ্ বটায়া হামনে
যের খজর ভী ইয়ে পয়গাম সুনায়্য হামনে।

—তুনি বল কেউ কি তোমার নাম এই মহীতলে ?
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহুবলে।

.. ..

আ'কিয়াহি মানব হাদে তাওহীদের চিত্র মোরা,
খজরের তলে থেকে দিয়াহি তাওহীদের সাড়া।

এভাবে কবি মুসলিম মিল্লাতের গৌরবময় অতীতের বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শেকওয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে কবিকে জওগাবে শেকওয়া রচনা করতে হয়। এখানে তিনি মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শুনিয়ে দিয়েছেন। জাতির অধঃপতনের মূলে কি উপাদান সক্রিয় ও তাওহীদবাদী জনতার উপর আঘাত হানছে, তার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে জাতির শিরায় অনল শিহরণ জাগিয়েছেন তিনি। কবি বলেন :

কলব মেঁ সুখ নিহী' রাহ মেঁ এহসাস নিহী'
কুহ্ ভী পয়গামে মুহাম্মদ কা তোমী' পাস নেহী'।

—রাহে নাহি অনুভূতি, অন্তরে না জ্বালা আছে,
মুহাম্মদের পয়গামেরও মর্যাদা নাই তোদের কাছে।

রহ গেয়ী রসমে আর্থ'। রাহে বেলালী ন রহী
ফলসফা রহগিয়া তালকীনে গয়ালী ন রহী।
মসজিদী' মরসিয়া খাঁ হেঁ কে নামাযী ন রহী
ই দ্বা'নী উওহ সাহেবে আওসাফে হেজাযী ন রহী।

—আযান দেওয়ার প্রথা আছে

নাই বেলালী প্রাণের সাড়া,

ফলসফা আর থাকলে কি হয়,

গায্বালীর শিক্ষা ছাড়া।

মসজিদ আজি কাদছে বসে

হায়! নামাযী কেউ তো নেই

হেজাযী সেই ভণে আজি

উপাধিত কেউ তো নাই।

এভাবে তিনি জাতিকে রসুলুল্লাহ (সঃ)-র উসওয়ায়ে হাসানার অনু-সরণ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আকুল আহবান জানিয়ে ইসলামী নব জাগরণের দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। পরিশেষে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও দিলেন যে, তাঁর আদর্শ ব্যতিরেকে তোমাদের মুক্তি সুদূর পরাহত।

বালে জিবরীল

'বালে জিবরীল' (জিবরাঈলের ডানা) কাব্য গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। এতে ৬১টি গমল ও ২৪টি চতুষ্পদী কবিতা রয়েছে। এ কাব্য গ্রন্থে বিশেষত কবি মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে চেয়েছেন। মানবতা বিধ্বংসী শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত মানবতাকে তিনি রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন।

সমাজের নিগৃহীত মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের পায়তারা চালায়, কবি সে সব শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। কবির প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে :

উঠো মেরী দুনিয়া কি গরীবো কো জাগা দো

কাখে উমারা কি দর ও দিওয়ার হেলা দো।

... ..

জিস ক্ষেতে সে দহকা কো মায়াসসর নেহী রুখী

ইসক্ষেত কি হার খোশায়ে গুনদম কো জলা দো।

—ওঠো বিশ্বের গরীব নিঃশ্বে জাগিয়ে দাও,

ধনীর প্রাসাদে টাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।

... ..

যে ক্ষেতের ফসল কাজাল বিষাপ গায় না খেতে,

সে ক্ষেতের শস্যসমূহ জ্বালিয়ে দাও।

বালে জিবরীলের বেশ কিছু কবিতা স্পেন সফরকালে রচিত। তাই এতে মসজিদে কড়োন্ডা ইত্যাদি কবিতাগুলো আমরা দেখি। তাছাড়া জিবরীল ও ইবদীস, আযান, ফিরিশতোঁ কি গীত, ফরমান-ই-খোদা কবিতাগুলোও উল্লেখ-

যোগ্য। 'ফরমান-ই-খোদা' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয়। এতে বিদ্রোহের সুর অনুরণিত। এভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় কবি দুর্দশাগ্রস্ত জাতির গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রকা ও সংহতি কামনা করেছেন।

আরমুগানে হিজায

'আরমুগানে হিজায' কাব্য-গ্রন্থটি ইকবালের প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। তাঁর একান্ত আশা ছিল হিজাযের প্রধান আকর্ষণ মক্কা ও মদীনা শরীফ ঘিরারত করে এ কাব্য-গ্রন্থের সমাপ্তি টানবেন। সে জন্য তিনি গ্রন্থের অনেক জায়গা অপূর্ণ রেখেছিলেন এবং এটা প্রকাশনার কোন উদ্যোগও নেন নি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর এ সাধ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি রক্তুল ইয্যতের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

এ কাব্য-গ্রন্থে কবি প্রধানত তাঁর মর্মবেদনা নিবেদন করেছেন আল্লাহ্‌র সমীপে, রসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে, জাতির খেদমতে, মানুষের খেদমতে ও সহ-গামীদের খেদমতে। আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর কথার নজরানা :

গোলামে জুয রযায়ে তু বখোয়ম

জুয আ' রা হে কে ফরমদী ন গোয়ম

... ..

মুসলমানে কে দর বন্দ ফিরিস আস্ত

দিলশ দর দস্তে উ আসা নয়ানদ

—গোলাম আমি তোমার খুশি

ছাড়া কিছুই চাইনে, তা ঠিক।

যেই পথেতে চলতে বলা

সে পথ ছাড়া যাইনে, তা ঠিক।

... ..

মুসলমান যে আটকে গেছে

ফিরিসিদের শিকার জালে,

ওদের নিকট থেকে হৃদয়

ফিরবে না আর সহজ তালে।

রসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে মুসলিম উল্লাহ্‌র দুর্দশা মুক্তির জন্য দু'আ চেয়েছেন :

শবে পেশ খোদা বগরীস্তম যার মুসলমানান

চরা যারন্দ ওয়া খোদারন্দ

নেদা আমদ ব ময়দানী কেহ্ ঈ কাওম
 দিলে দারন্দ ওয়া মাহবুবে ন দারন্দ ।
 ন গোয়ম আয ফরো ফালে কেহ্ বগুজশ্ত
 কেহ্ সোদ আয শরহে আহওয়ালে কে বগুজশ্ত ।

—বলবো কী যে এদের কথা,
 পঙ্গু গরীব দীন বেচারী,
 দাও এদের জ্ঞানের শাবল
 ভাগতে পারে অজ্ঞ-কারী ।
 এদের নিদ্রা হৃদয় পরে
 দাও বুলিয়ে দয়ার পরশ
 গড়ছে এরা ঘোর বিপাকে,
 রুদ্ধ এদের গতির ধারা ।
 বলবো কতো এদের কথা
 ঠিক মতো সব বলাই যে তার,
 দেখছো তুমি এদের গোপন
 এদের প্রকাশ—সকল ব্যাপার ।

জাতির খেদমতে তাঁর বক্তব্য :

বরো! আয সীনা কশে তকবীর খোদ রা
 বখাকে খোবীণ যন একসীরে খোদ রা ।
 খুদী রা গীর ও মাহকমে গীর ও খোশ যা
 মদা দর দস্তে কিস তকদীরে খোদ রা ।

—প্রকাশ করো তোমার বুকের
 তকবীরের ঐ উদার ধ্বনি,
 তোমার কালো এই মাটিতে
 বলাও আপন পরশ মনি ।
 নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে
 শক্ত হয়ে বাঁচতে শিখো,
 তোমার কপাল তুমিই গড়া
 দূর করো ওর সকল শনি ।

বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা

আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্য সাধনার সুখ্যাতি জীবদ্দশায়ই অবলোকন করে গেছেন। ১৯০৮ সালে পাশ্চাত্যের গ্রাণকেন্দ্র লন্ডনে ডটরেট ডিগ্রীর থিসিস গ্রন্থ Development of Metaphysics in persia এবং ১৯২০ সালে আসরারে হুদী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ Secrets of self প্রকাশিত হলে বিশ্বের খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর কালজয়ী প্রতিভার পরিচিতি সীমানা বিস্তৃত করে। ইকবাল শুধন একজন বহন আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিত্ব।

উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী মহলেও ইকবালের কাব্য-সাধনার হোঁচল মেলেছে। একই ভাষাভাষী ও একই ডুগুণ্ডে অধিক সংখ্যক মুসলিম জনসোচ্চী বসবাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। দশ কোটিরও অধিক উন্নত মুহাব্বতী (স্য) এদেশে বসবাস করছেন। স্বাভাবিকভাবে তাই জনসাধারণ তথা সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইকবাল-সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রসঙ্গ আসে। এজন্য আমরা বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা পর্ষায়ে কিছু তথ্য পেশ করতে চাই।

এক, ইকবালের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্ত্বার বাংলাদেশে নানা কারণে ইকবাল-কাব্যের খুব একটা আলোচনা হয়নি। বিগত কয়েক বছর থেকে ইকবাল-প্রতিভার পুনর্মুন্নাফন শুরু হয়েছে।

১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' (ফররুখ আহমদ অনুদিত) বইটি স্বাধীনতাত্ত্বার প্রকাশিত ইকবালের মেখা থেকে প্রথম কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' বইটির পুনর্মুদ্রণও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকবার।

দুই. বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে ইকবাল চর্চার দীনতা সত্ত্বেও এদেশের আলিম-মাশায়খ, বক্তা-ওরিয়েন্টালগণের মাধ্যমে তাঁর বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে সর্বতোভাবে। এদেশের ইসলামী সংগঠন, সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওরাজ মাহফিল ও ইসলামী সাহিত্যে ইকবাল কাব্যের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়। বস্তুতপক্ষে বলতে গেলে আল্লামা জালাল উদ্দীন রায়ী (রঃ)-এর মসনদী শরীফের পরই ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার জনপ্রিয়তা নির্ণয় করা যায়। অতএব আমরা একথা দ্বিধাহীন ভিত্তিতে বলতে পারি, আল্লামা ইকবাল এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে একটি সুপরিচিত নাম।

তিন. ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অধুনালুপ্ত ইকবাল একাডেমী, ঢাকা (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন মরহুম মিজানুর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ মনীষী। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একাডেমীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে—১. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaphysics in Persia); মূল ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল; অনুবাদ কামালুদ্দিন খান (১৩৭২ বাংলা) ২. আরমুগানে হিজায় (হেজাজের সত্ত্বাতঃ); মূল ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল; অনুঃ গোলাম সামদানী কোরাইশী, ৩. ইকবাল : দেশে-বিদেশে : সম্পাদনা মিজানুর রহমান (আগ্নিন ১৩৭৪ বাংলা), কালাম-ই-ইকবাল (নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ) গোলাম মোস্তফা (১৯৫৯ ইং)।

চার. প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, আল্লামা ইকবালের ইস্তিকালের ৮ মাস পূর্বে চট্টগ্রামের মাওলানা তমীযুর রহমান ‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’ অনুবাদের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। অনুমতি পত্রে কবি অনুবাদ মূলানুগ এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহলে তা সমাদৃত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। (প্রঃ ভূমিকা : শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, ১৯৩৮ ইং)। দুঃখের বিষয়, অনুবাদ-কার্য শেষ হওয়ার পরও বইটি প্রকাশে দেরী হয়। ইকবালের মৃত্যুতে চট্টগ্রামে আয়োজিত শোক সভায় প্রথমত ‘শেকওয়া’ পঠিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এটা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এঁদের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী কর্মবীরের সহযোগিতায় এ অনুবাদ ২০,০০০ কপি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের আলেমগণ ‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’র বাংলা অনুবাদ আবৃত্তি করতে গেলেই মাওলানা তমীযুর রহমান অনুদিত বাংলা অংশই

আরুতি করে আসছেন। তাঁর অনুবাদটি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হলে।, অনুবাদ সাবলীল ও মৃদুস্বভাবী হয়েছে। মূল কবিতার স্বাক্ষরও সার্থকভাবে সহজ ও সরল ভাষায় ফুটে উঠেছে। বর্তমানে এ অনুবাদ পুস্তিকাটির নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক মোহাম্মদ সুলতান ও 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' অনুবাদের জন্য সরাসরি ইকবালের কাছ থেকে অনুমতি পত্র লাভ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত পুস্তকটি ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদের ভাষাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ বইয়ের শেষভাগে আল্লামা ইকবালের সহস্বে লিখিত 'অনুমতি পত্র' ও কবি নজরুল ইসলাম-এর স্বহস্তে লিখিত 'অভিমত' পাঠক-পাঠিকাদেরকে আনন্দে আপ্ত করে। নজরুলের অভিমতটি এ ক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য :

‘সুলতান এর ‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই ‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’। উর্দু-ভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ শেকওয়ার বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুর্লভ মনে করেই আমি এতে হাতে দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিগমিত ছলাম। অরিজিন্যাল ভাবে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতিভঙ্গী দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে বাঙলার শাড়ির অবগুষ্ঠনে যেন আরো বেণী মানিয়েছে। (স্বাক্ষর : নজরুল ইসলাম, ১৫ই ডার ১৩৭৪ বাংলা)।

১৯৮৪ সালে অনুবাদ গ্রন্থটির তৃত্ব সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ. বাংলা ভাষায় অনূদিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার অনুবাদই হয়েছে সর্বাধিক। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, স্বাধীনতা (১৯৭১)-পূর্বকালে ছয়জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদকরা হলেন—ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রকাশকাল ১৯৪৫), আশরাফ আলী খান (প্রকাশকাল ১৯৪৬), মীজানুর রহমান (প্রকাশকাল ১৯৫৩), আশরাফ আলী খান (প্রকাশকাল ১৯৫৫), মাওলানা তমীযুর রহমান (প্রকাশকাল ১৯৬৩ শেকওয়া, ১৯৪৬

জওয়াবে শেকওয়া) মনীরুদ্দীন ইউসুফ (প্রকাশকাল ১৯৬০)। বর্তমানেও উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থগুলো প্রচলিত রয়েছে।

ছয়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইকবালের জীবন ও কর্মের উপর রচিত বই এবং অনুবাদ গ্রন্থের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

১. ইকবাল : জীবনী ও বাণী—ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাঁস পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪৯, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

২. মহাকাবি ইকবাল : লতীফা রশীদ, ১৩৫৪ বাংলা, বন্দাবন ধর বুক হাউস, ঢাকা।

৩. ইকবাল : ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৫৮, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স।

৪. আল্লামা ইকবাল : আবু বোহান নূর মোহাম্মদ, পাক কিতাব ঘর, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।

৫. ইকবালের শিক্ষা দর্শন : মূল : খাজা গোলাম সাইয়েদাঈন, অনুঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, অনুবাদ কাল ১৯৪৫-৪৬, প্রকাশকাল ১৯৫৮, মাহফুজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৬. ইকবাল : দেশে-বিদেশে : সম্পাদনা—মীযানুর রহমান, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা, (পূর্ব পাকিস্তান), ১৯৬২ ইং।

৭. আসরারে খুদী : ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল।। অনুঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, আল-হামরা লাইব্রেরী, কলিকাতা।। তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৪৫।

৮. রুমূযে বেখুদী : ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, অনুবাদ : আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৯. হেজাযের সওয়াত (আরমুগানে হিজাজ) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল অনুঃ গোলাম সামদানী কোরাইশী, ইকবাল একাডেমী, ককরাচী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৬২।

১০. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaphysics in persia) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনুঃ কামালুদ্দীন খান, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৩৭২ বাংলা।

১১. কালাম-ই-ইকবাল : (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) অনু : গোলাম মোস্তফা, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৫৯।
১২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন (The Reconstruction of Religious Thought in Islam) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনু : কামালুদ্দীন খান, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আ. ফ. মু. আবদুল হক ফরীদী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩।
১৩. ইকবালের কাব্য-সংগ্রহন : মনির উদ্দীন ইউসুফ : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।
১৪. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা : (অনুবাদ) ফররুখ আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮১।
১৫. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

পাশ্চাত্যে ইকবাল-চর্চা

ইউরোপের প্রবাস জীবনে (১৯০৫—১৯০৮) ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। প্রফেসর টমাস আরনল্ডের প্রিয় ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচিতির পথ আরো সগম হয়। তাই আমরা দেখি, মাত্র তিন বছর ইউরোপে থেকে তিনি বিপুল সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। সে সময় প্রাচ্য কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে ইকবালের সমাদর সবার শীর্ষে স্থান পায়। উক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৯০৭-১৯০৮)-তে প্রফেসর হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ সালে ডিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েও অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি।

লন্ডনে ১৯০৮ সালে তাঁর থিসিস 'Development of Metaphysics in Persia', ১৯২০ সালে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ আর. এ. নিকলসন কর্তৃক 'আসরারে শুদী'র অনূদিত 'Secrets of self', ১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam' প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর শুদী-দর্শন পাশ্চাত্যের জড়বাদী মানসে এক নবতর জীবনবোধের সজ্জান দেয়। তাঁর মননশীল সাহিত্য তাদের চিন্তা-কর্মণ করে।

ইকবালের মৃত্যুতে প্রাচ্যবাসী যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্য-বাসীও শোকাহত হয়েছিলেন। ব্রুটেন, ওয়াশিংটন ও জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইকবাল সোসাইটি'। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর প্রতিধ্বশা লেখকদের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিবরণ পেশ করছি :

১. জার্মান ভাষায়—Mohammad Iqbal and Welt des Islam (Köln 1959) by Baymirza Hayit.

২. ফিনিশ ভাষায়—Muhammad Iqbal (Helsinki, Finland 1954) by Henri Broms.

৩. ফরাসী ভাষায়—Luce-claude Maitre লিখিত Introduction a la pensee d' Iqbal (paris 1955)

৪. Dictionary of National Biography (1931-1940) তে Iqbal শীর্ষক sir H. A. R. Gibb এর লেখা প্রবন্ধ (Oxford University press, 1950) প্রকাশিত।

৫. Iqbal : His Art and Thought—S. A. Vahid, ১৯৫৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

পশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ইকবাল সাহিত্যের অধিকাংশই অনূদিত হয়েছে। ষাটের দশক পর্যন্ত যে সব বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

ইংরেজী ভাষায় :

1. Secrets of self—Dr. R. A. Nicholson. 'আসরারে খুদী'র অনুবাদ ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

2. Mysteries of Selflessness—A. J. Arberry, 'রুমুযে বেখুদী'র অনুবাদ ১৯৩৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

3. Poems of Iqbal—V. S. Kiernan. জরবে কলীম থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

4. Notes on Iqbal's Asrar-i-Khudi—Arthur J. Arberry, 'আসরারে খুদী'র ভাষা। ১৯৫২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

৫. Poems of Iqbal—Dr. H. T. Sorle. Aberdeen University press থেকে ১৯৩৩ সালে মুদ্রিত হয়। বাগে দরা কাব্যের নির্বাচিত ২১টি কবিতার অনুবাদ।

6. The Tulip of Sinai—Prof A. J. Arberry (London 1947) পদ্মামে মলারিক-এর অনুবাদ।

7. Persian Psalms—A. J. Arberry. যবুরে আজম-এর ইংরেজী অনুবাদ। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ইতালী ভাষায় :

1. Il Poema celeste by Alessandro Bausani. (Roma 1952).

2. Il Modernismo Musulmano del Indiano Sir Mohammad Iqbal. (Roma 1939).

উল্লেখ্য আমাদের সংগৃহীত তথ্যে ষাটের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরও বই প্রকাশিত হয়েছে।

Ardubus

ইকবাল-রচনাবলী

ইকবালের জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে ১৬ টি গ্রন্থ, ৪৫টি কবিতা, ৩০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এতদ্ব্যতিরিক্ত বিবরণ পেশ করা গেল :

গ্রন্থ

১. عام الاقتصاد (ইলমুল ইকতেসাদ) ১৯০৩ সাল, লাহোর।
২. Development of Metaphysics in Persia. ১৯০৮ সাল, লণ্ডন।
৩. شکوه وجواب شکوه (শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া) ১৯১২ সাল, লাহোর।
৪. اسرار خودی (আসরারে খুদী) ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।
৫. আখবার-ই-ইকবাল, লাহোর, ১৯১৮।
৬. رموز بیخودی (রুমুযে বেখুদী) ১৯১৮ সাল, লাহোর।
৭. خضر راه (খযর রাহ) ১৯২১ সালে এবং طلوع اسلام (তুলুয়ে ইসলাম ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ গ্রন্থ দু'টি (বাসে দরা) কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।
৮. پیام مشرق (পয়ামে মশরিক) ১৯২৩ সাল, লাহোর।
৯. بانگ درا (বাসে দরা) ১৯২৪ সাল, লাহোর।
১০. زبور عجم (যবুরে আজম) ১৯২৭ সাল, লাহোর।
১১. The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. ১৯৩১ সালে লাহোর প্রকাশিত হয়।
১২. جاوید نامہ (জাউদ নামা) লাহোর, ১৯৩২ সাল।
১৩. بال جبریل (বালে জিব্রীল) ১৯৩৫ সাল, লাহোর।
১৪. ضرب کلام (যরবে কলাম) এপ্রিল ১৯৩৬ সাল, লাহোর।

১৫. পচ ছে বায়দ করদ আয় আকওয়ামে শরক, লাহোর, ১৯৩৬।
 ১৬. ارمغان حجاز (আরমুগানে হিজাজ) লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।
 উল্লেখ্য, এ গ্রন্থটি ছাড়া বাকী ১৫টি গ্রন্থ কবির জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়।

কবিতা

(বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশিত)

- ১। আবদুল কাদির কি নাম—মাসিক মাখযান, লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯০৩।
- ২। আবর-ই-কুসর—মাসিক মাখযান, লাহোর, নভেম্বর, ১৯০১।
- ৩। আফকার-ই-ফলক পয়মা—মুরাওয়া, লঙ্কো, জানু, ১৯২৯।
- ৪। আ'লা হযরত মালিক-ই-মুয়াজ্জাম কি পয়গাম কা জওয়াব—পাজাব কি তুরফ সে—হক, ২৭শে জুলাই, ১৯১৮।
- ৫। বাচ্ছা আওর শামা—মাসিক মাখযান, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।
- ৬। দরবার-ই-ভাওয়ালপুর ঐ, নভেম্বর, ১৯০৩।
- ৭। দরদ-ই-ইশক—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩।
- ৮। দো সিতারে—মাসিক মাখযান, লাহোর, আগস্ট, ১৯০৯।
- ৯। দু'আ—ফিরদাউস, লাহোর, জুলাই, ১৯২৮।
- ১০। এক দরদমন্দ দিল কি আরয—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই আগস্ট, ১৯০৩।
- ১১। এক পরিদা আওর জুগনু—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুলাই, ১৯০৫।
- ১২। এক সাহেবে দিল কি আরয—পাজ-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩।
- ১৩। এক ইয়াতীম বাচ্ছে কি ফরিয়াদ-পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, এপ্রিল ১৯০২।
- ১৪। শাম কি আমদ ঐ
- ১৫। গাওহার-ই-নায়াব—তুলুয়ে ইসলাম, দিল্লী, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।
- ১৬। গায়ব মাতবুয়া কালাম—ফিরদাউস, লাহোর, ১৯২৯।
- ১৭। গযল—এশিয়া, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯০৮।
- ১৮। গযল—কাশাফ, অমৃতসর/২১ মার্চ, ১৯২৫।
- ১৯। গোরস্তানে শাহী, মাসিক মাখযান, লাহোর, জুন, ১৯১০।

- ২০। হামারা দেশ, মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০১।
- ২১। হসন ও জিবাল, ঐ মার্চ, ১৯০৬।
- ২২। ইনসান ও বয়সে কুদরত, পাজা-ই-ফাওলাদ, ২১, অক্টোবর, ১৯০৫।
- ২৩। ইকবাল কি দো নজ্জমে—মাসিক সাকী, করাচী, জুন, ১৯৫৯।
- ২৪। জিহাদ—মাসিক বালাগ, অমৃতসর, এপ্রিল, ১৯৩৭।
- ২৫। খামুশী—মাসিক হুমায়ুন, লাহোর, মার্চ, ১৯২২।
- ২৬। খত-ই-মনজুম—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, জুলাই, ১৯০২।
- ২৭। খিলাফত আউর তুর্ক ও আরব—মাসিক মা'আরিফ, আজমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪।
- ২৮। শূফতাগানে খাক সে ইসতিফসার—মাসিক মাখযান, লাহোর, নভেম্বর, ১৯০৫।
- ২৯। কিনার-ই-রাবী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৫।
- ৩০। কোহিস্তান-ই-হিমালী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৫।
- ৩১। মাউজে দরীয়া—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, নভেম্বর, ১৯২৮।
- ৩২। মীলাদ-ই-আদম—মাসিক তুলুয়ে ইসলাম, দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৩৮।
- ৩৩। মীরা গালিব—মাসিক আদিব, এলাহাবাদ, জুলাই, ১৯১২।
- ৩৪। মুহাব্বাত—মাসিক মাখযান, লাহোর, জানুয়ারী, ১৯০৬।
- ৩৫। নাজা-ই-ফিরাক— ঐ, মাসিক মাখযান, লাহোর, মে, ১৯০৩।
(ইকবালের অন্যতম শিক্ষক স্যার টমাস আরনল্ডের বিদায় উপলক্ষে রচিত।)
- ৩৬। নাওয়া-ই-ইকবাল—মাসিক মুরাজ্জা, লক্ষ্মী, এপ্রিল, ১৯২৬।
- ৩৭। মায় কোন্ হোঁ এবং দুনিয়া কিয়া হ্যায়—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ১৯০২।
- ৩৮। পদনাম-ই-ইশক—মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০৮।
- ৩৯। রুবাইয়াত—কাশ্মীরী গেজেট, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০১।
- ৪০। রুখসাত আয় বয়সে জাহাঁ—মাসিক মাখযান, লাহোর, মার্চ, ১৯০৪।
- ৪১। সেঈদীয়ার—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯১৭।
- ৪২। শিনাসা-ই-রায—মাসিক সুফী, মার্চ, ১৯১৩।
- ৪৩। শো কহিরা—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুন, ১৯১০।

৪৪। জুবান-ই-হাজ—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, মার্চ, ১৯০২।

৪৫। গাররাহ-ই-শাওরান যা হিনান-ই-দৈন, মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯১১।

প্রবন্ধ

(উর্দু)

১। আবাদী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৪। কবির ইলমুল ইকতেসাদ বইয়ের অংশ বিশেষ।

২। আসরারে খুদী আওর তাসাউফ—ভাকিল, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯১৬।

৩। আওরতোঁ কি মৃত্তাআল্লিক দিল সচ্প রাগিঁ—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, ২১ জানুয়ারী, ১৯৩০।

৪। ইসতিহকাম আওর মিল্লাত-মাসিক তুলুয়ে ইসলাম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

৫। জনাব রিসালতে মা'ব কি আবাদী তবসিরাহ—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল।

৬। খাজা আজীজ উদ্দীন আযীয লঙ্কৌবী কি ফাসী শায়েরী কি মৃত্তা-আল্লিক রাগ—মাসিক নায়ায়াস কি কায়াল, লাহোর, সালনামাহ ১৯৩২।

৭। কিয়া কওমীয়ত কি বুনিয়াদ জিওগ্রাফিয়া-ই-ওয়াতান পর হায়া—দৈনিক ইনকিলাব, লাহোর, মার্চ ১০, ১৯৩৮।

৮। মাহফিল-ই-মীলাদুন্নবী (সঃ)—ইসলামী তারাকিব, করাচী, ১৯৫২।

৯। মুসলমানোঁ কা ইমতেহান—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, জানুয়ারী ১৪, ১৯১৩।

১০। নবী-ই-করীম কি পেশগী তাসাউফ-ই-উজুদিয়াহ কি মৃত্তাআল্লিক-ভাকিল, অমৃতসর, ডিসেম্বর, ১৯১৬।

১১। পয়আম-ই-আখিরীন-মিহির-ই-নিমরোজ, করাচী, এপ্রিল, ১৯৬০।

১২। কাওমী জিন্দগী—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুলাই, ১৯১৭।

১৩। শাহী কমিশন কি মৃত্তাআল্লিক রাগ—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, নভেম্বর ১৪, ১৯২৭।

১৪। সির-ই-খুদী—ভাকিল, অমৃতসর, ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯১৬। আগ্রা আখবার, আগ্রা, মার্চ ৭, ১৯১৬।

- ১৫। স্বদেশী তারীখ আউর আখবারান-ই-ইসলাম, মাসিক যামানা, কান-পুর, মে, ১৯০৬।
- ১৬। তাকসীম-ই-ফিলিস্তীন—মাসিক পয়গাম-ই-হক লাহোর, জানুয়ারী ১৯৩৮।

(ইংরেজী)

1. A Plaa for deeper study of the Muslim scientists—Quarterly Islamic Culture, Haiderabad, Deccan, April 1929.
2. Doctrine of Absolute Unity as explained by Abdul Al-gilani—monthly Indian Antiquary, Bombay, Sept 1900.
3. Is Religion Possible ? in the proceedings of the Aristotolian Society প্রবন্ধটি পরবর্তীতে The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam বইয়ে সংযোজিত হয়।
4. Islam and Ahmadism—Fortnightly Islam, Lahore, January 22, 1936.
5. Islam and khilafat—Sociological Review. London, 1908.
6. Islam and Qadianism—Anti-Qadian League, Lahore.
7. Islam is a moral political ideal -Hindustan Review, 1936.
8. Khushal Khan Khattak—quarterly Islamic Culture, Haiderabad, Deccan, 1928.
9. Mc. Teggart's Philosophy—Indian Arts and Letters, 1932.
10. Notes on Muslim Democracy, New Era, 1916.
11. On Corporeal Resurrection after Death, Muslim Revival, Lahore, September 1932.
12. Political Thought in Islam—Hindustan Review, December 1910 and January 1911.
13. Self in the Light of Relativity-Crescent, Lahore 1925.
14. Some study Notes-Muslim Revival, Lahore, Sept. 1932.

জীবনপঞ্জী

জন্ম : ২৪শে ফিলহুজ্জ ১২৮৯ হিজরী মূতাবিক ৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭
(মতান্তরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) ইংরেজী রোজ শুক্রবার।

শিক্ষা : ৫ বছর বয়সে মতাবে ভর্তি।

১৮৮৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত।

১৮৮৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৮৯১ সালে স্কট মিশন হাইস্কুল (সিয়ালকোট) থেকে অষ্টম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে 'মেডেল' পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৩—উক্ত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং স্বর্ণপদক ও হুন্ডি লাভ করেন।

১৮৯৫—সিয়ালকোট স্কট মিশন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

১৮৯৬—জীবনের সর্বপ্রথম মুশায়েরা (কবিতানুষ্ঠান)-এ অংশগ্রহণ।

১৮৯৭—লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ বি. এ. ডিগ্রী লাভ এবং জামাল উদ্দীন পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৮৯৯—উক্ত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এম. এ. (দর্শন) পাশ করেন এবং লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা শুরু।

১৯০০—লাহোর আজুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায় 'নানিয়ে ইয়াতীম' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি।

১৯০১—এপ্রিল মাসে লাহোরের সর্বশ্রেষ্ঠ উদু পত্রিকা মাখযান-এ হিমা-লাহ কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯০০-১৯০৩—লাহোরের বাণী দরওয়াযায় বসবাস।

১৯০৩—লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।

১৯০৫—দিল্লী নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার মাযার শিয়ারত এবং পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার জন্য জার্মানী গমন।

১৯০৭—জার্মানীর মিউনিক ইউনিভার্সিটি থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ।

১৯০৭-১৯০৮—লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা।

১৯০৮—বার-এট-ল (লন্ডন) ডিগ্রী লাভ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ২২শে অক্টোবর থেকে লাহোরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন।

১৯১১—লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন বাবসা করার অগ্রিম্রায়ে আবেদন পত্র পেশ করেন। এ বছরই তিনি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্য 'শেকওয়া' লাহোর আজুমানে হেমায়েত ইসলামের সভায় আবৃত্তি করেন। এ ছাড়া তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের (দর্শন বিভাগে) অধ্যাপনাও করতেন।

১৯০৮-১৯২১—লাহোর আনারকলিতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সভা ও কবিতানুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

১৯১৩ 'তারীখে হিন্দ' রচনা করেন।

১৯১৪—৯ই নভেম্বর সিয়ালকোটে তাঁর আশ্মাজান ইমাম বিবি ইন্তেকাল করেন।

১৯২০—কশ্মীর শ্রীনগর সফর।

১৯২২—বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'সার' উপধিতে ভূষিত হন।

১৯২৩—১ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক রচনা।

১৯২৪-১৯২৮—পাজাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

১৯২৫—লাহোর ইসলামিয়া কলেজে 'ইসলাম ও জিহাদ' শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দান।

১৯২৮—মাত্রাজ, হায়দরাবাদ ও মহিশূর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বক্তৃতা প্রদান।

১৯৩০—আক্বাজান শেখ নূর মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেন।

অল-ইন্দিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩১—ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত 'মু'তামারি আলমে ইসলামী' (ইসলামী বিশ্ব সম্মেলন)-এ যোগদান। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত দাপ্তরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান।

১৯৩২—প্যারিসে নেপোলিয়নের সমাধি পরিদর্শন এবং প্রথাত ধর্ম-
তত্ত্ববিদ Messignon-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৭ই নভেম্বর থেকে ২২শে
ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান।
ইটালী (রোম)-এর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ। স্পেনে 'দোয়া' 'মসজিদে
কর্ডোভা' প্রভৃতি কবিতা রচনা।

১৯৩৩—অক্টোবর মাসে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানি-
স্তান সফর।

লাহোর পাক্ষা ইউনিভার্সিটি 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধিতে ভূষিত
করেন।

১৯৩৩—শারীরিক অসুস্থতার ফলে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ।

১৯৩৫—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর পদে নিয়োগ
পত্র লাভ, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অপারগতা সূচক জবাব প্রেরণ।
'ওসীয়াত নামা' লিপিবদ্ধ করেন।

১৯৩৬—আলীগড় ইউনিভার্সিটি ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

১৯৩৭—এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

১৯৩৮—মিসরের জামেয়া আযহারের শিক্ষাবিদগণ লাহোরে তাঁর
সাথে সাক্ষাৎ করেন। শারীরিক অসুস্থতার ফলে অবকাশ যাপন।

১৯৩৮—জুহুয়ার লাল নেহেরু তাঁর সাথে জানুয়ারী মাসে সাক্ষাৎ
করেন।

২১শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর
সান্নিধ্যে মিশিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী

- (১) সীরাতে ইকবাল (سيرت اقبال) প্রফেসর তাহের ফারুকী, কওমী কুতুব খানা, লাহোর, ১৯৩৯।
- (২) ইকবালিয়াত কা তানকীদী জায়েযাহ্ (اقبالیات کا تنقیدی جائزہ -) আহমদ মিয়া আখতার, ইকবাল একাডেমী, করাচী।
- (৩) আসরারে খুদী (اسرار خودی) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : সৈয়দ আবদুল মান্নান অনুদিত।
- (৪) রুমূযে বেখুদী (رموز بیخودی) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী অনুদিত।
- (৫) বাঙ্গে দরা (ہانگ درا) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : মনীর উদ্দীন ইউসুফ অনুদিত।
- (৬) শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (شکوہ و جواب شکوہ) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : মাওলানা তমীমুর রহমান অনুদিত।
- (৭) আরমুগানে হিজায (ارمان حجاز) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : গোলাম সামদানী কোরাইশী অনুদিত।
- (৮) বালে জিবরীল (ہال جبریل) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল।
- (৯) তারীখে ইসলাম : মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেরী (রঃ)।
- (১০) আমাদের কবি : আ. ন. ম. বজলুর রশীদ।
- (১১) ইকবাল আওর মওদী : তাকবুলী মৃতালি'আ—প্রফেসর উমর হাফাত খান, লাহোরা।
- (12) Bibliography of Iqbal : K. A. Waheed, Iqbal Academy, Karachi.



কর্ডোভা মসজিদে নামাযরত ইকবাল



আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল



পাঠরত ইকবাল



বার্গকো ইকবাল

Delaware

21st June 1936

My dear Jaggivan,

Thanks for your letter which I read a moment ago.
Your summary is excellent & I have got nothing
to add. My ~~book~~ will, I hope, be published about
the end of June & I will send you ~~it~~ the
manuscript in a common copy. Your collection has
a part I wish to ~~send~~ you may not find
anything new in it; get of it reaches you
in time you may read the portion mentioned
above.

I suppose you are aware of the educational
implications of Leibniz's monadism. According to
him the monad (the mind of man) is a closed window
impassable to passing external disturbing external
forces. My view is that the monad is essentially
amalgamated in its nature: Time is a great blessing
(بشارة الزمان). While it kills & destroys it also expands
& brings out the hidden possibilities of things. The
possibility of change is the greatest wish of man
in his present surroundings.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

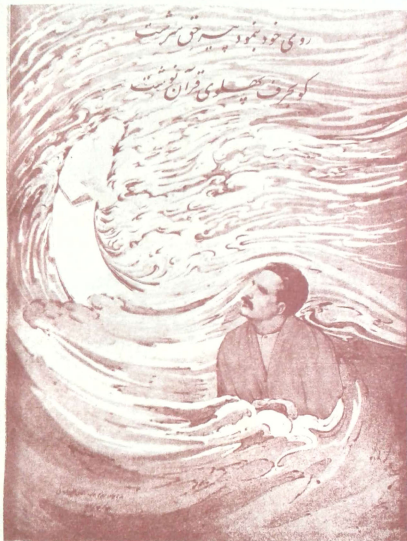
P.S. My general health has much improved.
The improvement in the voice is slow.

SC:

রুমী অقبال

রুমী خود بنمود پس حق سرشت

کو حرف پهلوی قرآن نوشت



শিখী হুসাইন বিহুয়াদ-এর অনুরূপ-চিত্রে আল্লামা রুমী ও ইকবাল

কি যে মনঃ খোদায় প্রাণের
কোন আশ্রম নাহি মনঃ
এই মনঃ প্রাণের
জীবন প্রাণের

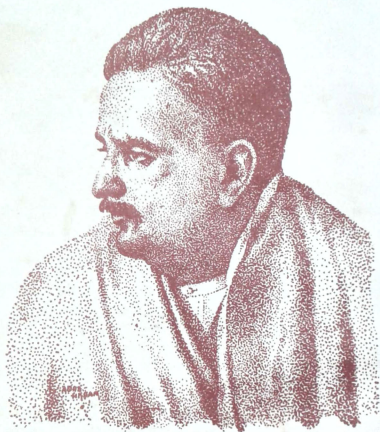
ফুল ফুলে ফুলে
ফুল ফুলে ফুলে

ফুল ফুলে ফুলে
ফুল ফুলে ফুলে

ফুল ফুলে ফুলে
ফুল ফুলে ফুলে

ফুল ফুলে ফুলে
ফুল ফুলে ফুলে

ফুল



শিখী আবদ হাसान (লাহোর)-এর কালি-কলম স্কেচ